দাম : ষোলো টাকা

চন্দ্রযান ১-২-৩ : মহাকাশ গবেষণায় ভারতের এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সাফল্য
— পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বামেদের তৃণমূল বিরোধিতা লোক-ঠকানো গিমিক মাত্র
— পৃঃ ১১

৭৫ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা।। ৩১ জুলাই, ২০২৩।। ১৪ শ্রাবণ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

চন্দ্রযান-৩
সফল উৎক্ষেপণ

মহাকাশ গবেষণায় ভারতের নতুন অধ্যায়ের সূচনা

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৩১ জুলাই - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

অনুপ্রবেশকারী মমতা! 'এ কেমন রঙ্গ জাদু এ কেমন বঙ্গ' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মৃত্যুর আমরা-ওরা বারুদ ভিজছে রক্তে ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

২০২৪-এর আসন্ন লোকসভা নির্বাচন—জোট বাঁধার পাটীগণিত ☐ আর. জগন্নাথন ☐ ৮

দেশের নামে বিরোধীদের জোট ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র বদল করেছেন মোদী ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বামেদের তৃণমূল বিরোধিতা লোক-ঠকানো গিমিক মাত্র ☐ ড. তরুণ মজুমদার ☐ ১১

পশ্চিমবঙ্গের ঘুরে দাঁড়ানো খুব কঠিন নয় ☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ১৩

পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংসের কারিগর আপনারাও বুদ্ধবাবু ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ১৫

চন্দ্রযান ১-২-৩ : মহাকাশ গবেষণায় ভারতের এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সাফল্য ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৩

চন্দ্রযান-৩ : ভারতের চন্দ্রাভিযানের নতুন মাইলফলক ☐ রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জী ☐ ২৭

ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত মোদী; গর্বিত দেশবাসী ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ২৯

পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় ☐ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ☐ ৩১

প্রসিদ্ধ ও জাগ্রতা দেবী পাতালভেদী শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালী ☐ দীপা প্রামাণিক ☐ ৩২

স্বাদেশিকতায় কবি অতুলপ্রসাদ সেন ☐ দীপক খাঁ ☐ ৩৪

সিন্ধুসভ্যতা থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্ণালংকারের সমান কদর ☐ হীরক কর ☐ ৩৫

স্বাধীনতা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের নাটক 'আগুন পাখি' ☐ প্রবীর ভট্টাচার্য ☐ ৩৮

দেশের নামের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয় ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ৪৩

জাহাজে তিন সপ্তাহ ☐ শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ৭ আগস্ট, ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৭ আগস্ট, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মণিপুরের সত্যি মিথ্যে

মণিপুরে হিংসা এবং আতঙ্ক চরম শিখরে পৌঁছেছে। মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে, খুন হচ্ছে। এই ঘটনাকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। আশা করা যায় স্থানীয় প্রশাসন শীঘ্রই ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বিরোধী নেতারা সবকিছুর জন্য যেভাবে মোদী সরকারকে দায়ী করছে সেটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে মণিপুরের সত্যি মিথ্যে নিয়ে বিস্তরিত বিশ্লেষণ।

লিখবেন— ড. রাজলক্ষ্মী বসু, হীরক কর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতের তৃতীয় চন্দ্রাভিযান

পূর্বে জানলা খুলিলেই চাঁদমামাকে দেখা যাইত। কখনও মনে হয় নাই পৃথিবী থেকে চন্দ্র অনেক দূরে। যেন হাত বাড়াইলেই স্পর্শ করা যাইবে। এই চাঁদ দেখিয়া কবিদের কল্পনাস্রোত বাঁধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আবার ভারতবর্ষের শিশু তাহাদের প্রিয় চাঁদমামাকে দেখিয়া পরমোল্লাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রের সহিত ভারতের গৃহস্থালী বহু প্রাচীনও বটে, সুখেরও বটে। সহস্র কলঙ্কও চন্দ্রের লক্ষ্মীশ্রী মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

ভারত ২০২৩ সালে তাহার তৃতীয় চন্দ্রাভিযান শুরু করিয়াছে। মহাকাশযানের নাম চন্দ্রযান-৩। নাম শুনিয়াই বোঝা যাইতেছে ইহার পূর্বে চন্দ্রযান-১ ও চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সফল হয় নাই। এই দুই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই ভারতের তৃতীয় প্রয়াস। প্রশ্ন উঠিবে, চন্দ্রযান-২ ও চন্দ্রযান-৩-এর মধ্যে পার্থক্য কী? দুইটি ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে চন্দ্রযান-২ ও চন্দ্রযান-৩-এ ল্যান্ডার রহিয়াছে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিক্রম। রহিয়াছে একটি রোভার, যাহার নাম প্রজ্ঞান। পার্থক্য শুধু একটি স্থলে, চন্দ্রযান-২-এ অরবিটার ছিল, চন্দ্রযান-৩-এ তাহা নাই। অতঃপর চন্দ্রযান-৩ যদি সফলভাবে চন্দ্রে অবতরণ করিতে পারে তাহা হইলে ভারত যে নতুন ইতিহাস রচনা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রযান-২ ব্যর্থ হইবার পর দেশে-বিদেশে অনেকেই ভারতকে কটাক্ষ করিয়াছে। এই কথাও বলা হইয়াছে ভারতের মতো দেশের এইসব ব্যাপার হইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কী? চন্দ্রযান-৩-এর সফল উৎক্ষেপণ করিয়া ভারত তাহার সমুচিত জবাব দিয়াছে। কিন্তু এই সাফল্য একদিনে আসে নাই। স্বাধীনতার পর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ডাক দিয়েছিলেন জয় জওয়ান জয় কিষাণ। সদ্য স্বাধীন একটি দেশকে অনিবার্য খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি দেওয়া এবং নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করাই ছিল এই আহ্বানের উদ্দেশ্য। ইহার পর ১৯৭৪। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্মাইলিং বুদ্ধ কার্যক্রমে পোখরানে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইলেন। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পোখরানে দ্বিতীয়বার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইলেন। এইসব ঘটনা নিঃসন্দেহে ভারতের অগ্রগতির একেকটি মাইলফলক। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে আমরা যেমন ৪-জি থেকে ৫-জি-তে উত্তরণ দেখিয়াছি, বিকল্প মেধার বিচ্ছুরণ দেখিয়াছি ঠিক তেমনি চন্দ্রযান-৩-এর সফল উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষগোচর হইল। বলাইবাহুল্য, ইহার পরও ভারতের বিরোধী নেতারা নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করিতে ছাড়িবেন না। মোদীর নিন্দামন্দ না করিলে তাহাদের খাবার হজম হয় না। সুতরাং তাহারা তাহাই করুন, ভারত এগিয়ে চলুক অগ্রগতির পথে।

সুভাষিতম্

যদিচ্ছসি বশীকর্তুং জগদেকেন কর্মণা।

পরাপবাদসস্যেভ্যঃ গাং চরন্তি নিবারয়।।

যদি কোনো একটি কাজে জগৎকে বশীভূত করতে হয়, তবে পরনিন্দারূপী ধানখেতে বিচরণকারী জিহ্বারূপী গাভীকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

অনুপ্রবেশকারী মমতা !

‘এ কেমন রঙ্গ জাদু এ কেমন বঙ্গ’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অহমিয়া গায়ককে দিয়েই শুরু করলাম। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে রঙ্গ চলছে তাতে ঘোড়াও হাসবে। অবশ্যই রঙ্গকারীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড পার্টি। কবি বলেছিলেন বঙ্গ রঙ্গে ভরা। সম্প্রতি মমতা ২৬ দলের একটি রঙ্গ জোটে শামিল হয়েছেন। সেখানে তার প্রধান শত্রু সিপিএম আর জাতীয় কংগ্রেসও রয়েছে। ২১ জুলাইয়ের ‘মমতা দিবসে’ তিনি পরম শত্রুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেননি। উলটে তাদের সঙ্গে ঘর করবেন বলে জানিয়েছেন। তা হলে মমতা এই প্রথম ঘর পেতে চলেছেন। আমার সন্দেহ সে ঘর শীঘ্র ভাঙবে। মমতা খুশি মনেই নিজের ঘরে ফিরবেন।

আই-এন-ডি-আই-এ নামে ওই সার্কাসে মমতা এক প্রকার অনুপ্রবেশ করেছেন। কেউ তাঁকে সাদরে চেয়েছেন বলে মনে হয় না। অনেকটা লোক দেখানো মমতা বা বাধ্য হয়েই তাঁকে ডাকা হয়েছে। কারণটা সবাই জানেন। তাদের তুলনায় ওই জোটের প্রধান শত্রু বিজেপির সঙ্গে ঘর করতে মমতা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাহলে মমতা গেলেন কেন? মমতা জানেন বাকিরা তাঁকে প্রতীকী হিসেবেই ডেকেছেন। তাই তিনিও প্রতীকী উপস্থিতি দিয়েছেন। সবটা গ্রহণ করেছেন বলে আমার মনে হয় না। কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে আসার পর সেই কংগ্রেস আর বিজেপির সঙ্গে বহুবার ঘর করেছেন মমতা। কোনোটাই টেকেনি। মমতা জানেন খিচুড়ি জোট টেঁকে না। এক যজ্ঞের খিচুড়ি অন্য যজ্ঞে লাগে না। আই-এন-ডি-আই-এ খিচুড়িতে সকলে জুটেছে আলাদা আলাদা অ্যাজেন্ডা নিয়ে আর তার মধ্যে রয়েছে বিজেপি মুক্ত ভারত গড়ে তোলা। এই মুহূর্তে যা ভীষণরকম হাস্যকর। অনেকে ভুলে গিয়েছেন দু’বছর আগেই মমতা ‘কংগ্রেস মুক্ত’ ভারত গড়তে নিঃশব্দে বিজেপির সঙ্গী হয়েছেন। পূর্বেও এই ধরনের বহু সার্কাসে যোগ দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন মমতা।

মমতার রঙ্গ তিনি সদা জোটহীন থেকেও জোটের বার্তা দিতে পারেন। মমতা চারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও কোনোটির মেয়াদ পূর্ণ করেননি। তিন-চারবার বিভিন্ন জোটে থেকেও দিল্লি পৌঁছানোর আগের স্টেশনে জোট গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমি হীরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রের উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের মিল পাই। ‘যন্তর-মন্তর’ ঘরে যিনি ছিলেন একা। তফাত একটাই। তিনি ছিলেন উন্মাদ। আর মমতা চতুর। মমতার সমর্থকরা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান তা যেমনই দেখতে হোক না কেন। এটা আবার একটা রঙ্গ যা তৃণমূলের মধ্যেই কেবল লিপিবদ্ধ। প্রায় দু’বছর ধরে রঙ্গবঙ্গে প্রশাসনিক আর দলীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লিখে হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের ঘুম ভাঙেনি।

এই রাজ্যে মমতা জমানাকে যে কংগ্রেস আর সিপিএম সবচেয়ে বেশি বদনাম করেছে আজ তারাই মমতার সঙ্গে হাতে হাত ধরে আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলবে ‘ বিজেপি হটাও মমতা বাঁচাও’।

পঞ্চায়েত ভোটের ফল বলে দিয়েছে ওই সব লেখা আপাতত বাতিল হয়ে গিয়েছে অথচ গ্রামবাঙ্গলার একশো জন ভোটারের মধ্যে ৪৯ জন মমতার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। সন্ত্রাসটুকু বাদ দিলে ওই সংখ্যাটা ৫০-এর ওপর যে কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারে। তার পরও শাসক হিসেবে মমতা ধাক্কা কেন খাচ্ছে না। আসলে মমতা যা পারে বিরোধী বিজেপি তা পারে না। এর মূলে রয়েছে এক অর্থহীন নৈতিকতা।

মমতার সঙ্গী রাজনৈতিক চাতুরি। বহু রাজ্যে দল ভাঙিয়ে রাজনৈতিক চাতুরির সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। সেখানে নৈতিকতা কাজ করেনি। অথচ এ রাজ্যে বিজেপি নৈতিক। নীরব। কেন? তারা বাম আর কংগ্রেসের সঙ্গে মহাজোটের বিরুদ্ধে। মমতা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বাম কংগ্রেসের সঙ্গে শামিল। মমতা এ রাজ্যে অনৈতিক আর চতুর। ভোট ভাগাভাগি করে জয়ী। সাগরদীঘি উপনির্বাচন হেরে যাওয়ার পর তাই বলেছিলেন বিজেপি-বাম-কংগ্রেসের অনৈতিক জোট তাদের হারিয়েছে। বিজেপিকে আটকাতে সব রকমের নৈতিকতা ভুলে মমতা তার চিরশত্রু জাতীয় কংগ্রেস আর সিপিএমের নৌকায় সওয়ার হয়েছেন। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির বহিরাগত বর্গীর তকমা সরিয়ে তার বিরুদ্ধে ‘পশ্চিমবঙ্গের বদনাম’ করার সওয়াল করছেন মমতা।

হাসি পাচ্ছে এই রাজ্যে মমতা জমানাকে যে কংগ্রেস আর সিপিএম সবচেয়ে বেশি বদনাম করেছে আজ তারাই মমতার সঙ্গে হাতে হাত ধরে আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলবে ‘মমতা নয় বিজেপি এই বঙ্গের বদনাম করছে— বিজেপি হটাও মমতা বাঁচাও’। এ কেমন রঙ্গ জাদু এ কেমন বঙ্গ। হেথা রাজনীতি পোড়ায় নীতি। পোড়ে না তো অঙ্গ। ■

মৃত্যুর আমরা-ওরা বারুদ ভিজছে রক্তে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীযু দিদি,

আমাদের লোক বেশি মরেছে। ওদের অনেক কম। সুতরাং, ওরা এগিয়ে। আমরা পিছিয়ে। আমরা বদলা নিতে চাই না বলেই আমাদের লোক বেশি খুন হলেও আমরা বেশি খুন করিনি।

চায়ের দোকানে তৃণমূলের হয়ে যাঁরা সকাল থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত প্রচার করেন তাঁরা এই কথাগুলো বলছেন। তাঁরা শিখছেন টিভি দেখে। কারণ, পঞ্চায়েত ভোটের গোটা পর্বে দিদি, আপনার দলের নেতারা টিভির বিতর্কে এই কথাই বলে এসেছে। বারবার পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছে তৃণমূলের লোকেরা বেশি খুন হয়েছে। এটা ছিল বেসরকারি, রাজনৈতিক দাবি। কিন্তু এবার আপনি সেই দাবিতে প্রশাসনিক সিলমোহর দিয়ে দিলেন। আপনার কাছে আমি এটাই আশা করেছিলাম। শহিদ দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন আপনার দলের আরও অনেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শহিদ হয়েছে। অন্য দলের যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা ওসব শহিদ, ফহিদ কিছু নয়। জাস্ট বডি হয়ে গিয়েছে। বাড় বেড়েছিল, মরে গিয়েছে।

শহিদ দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দিদি, আপনি কিছু হিসেব দিয়েছেন। সবটাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার হিসাব। সেখানে আপনি অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা না করে ভালোই করেছেন। কারণ, সেটা করলে ধরা পড়ে যেত যে 'এগিয়ে বাংলা'। মানে হিংসায়। অন্যত্র যেখানে শূন্য সেখানে বাংলায় রোজ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। আপনি বলেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসায় তৃণমূলের মানে আপনার দলের যতজন কর্মী মারা গিয়েছেন, বিরোধী দলের নিহত কর্মীর সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। যদিও আগে আমি ভাবছিলাম যে, সবাই তো আপনার রাজ্যের মানুষ। সেই হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী আপনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সবার জন্যই আপনার চোখের জল ফেলা উচিত। সব মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো উচিত। কিন্তু এখন দিদি আপনি বলে দেওয়ার পরে আমিও শিখে গেলাম। আমি শিখে গেলাম মৃত্যুতেও আমরা ওরা বিভাজন করা যায়। মুখ্যমন্ত্রীও পারেন।

দিদি আপনি জানিয়েছেন, গোটা রাজ্যে হিংসা হয়েছে মাত্র তিন-চারটি জায়গায়। আমি সংখ্যাটা অনেক বেশি জানতাম। আপনি বলার পরে সংশোধন করে নিয়েছি। আপনি জানালেন, ২০০৮ সালে মানে বাম জমানার শেষ দিকে শুধুমাত্র পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনই নিহত হয়েছিলেন ৩৯ জন— এ বছর কয়েকটি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' ঘটেছে মাত্র।

আপনার কথাগুলির মধ্যে দিদি দু'টি বার্তা রয়েছে। এক, এই ভোটের রাজনৈতিক হিংসার পরিমাপ নিয়ে রাজ্যের শীর্ষনেত্রী সব জানেন। দুই, হিংসার উৎস ও সূত্রকে অস্বীকার করতে চান। ঠিকই করেছেন। কারণ, সব মেনে নিলে আপনার দিক থেকেও অনেকটা আত্মস্খলন মেনে নিতে হতো।

কিন্তু দিদি, রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা যে ভাবে দেশজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে, সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার দায় অস্বীকার করতে পারেন কি? না, দিদি। আমার প্রশ্ন নয়। সবাই বলছে। তাঁরা আরও বলছেন, মৃতের আমরা-ওরা করার অবাঞ্ছিত ও কুরুচিকর হিসাব দিয়ে প্রশাসক তাঁর ব্যর্থতা ঢাকতে পারেন না। বরং, এসব বলে আপনি নাকি বুঝিয়ে দিলেন, রাজ্যের ক্ষতস্থানটি নিরাময়ের কোনও চেষ্টাই তিনি করবেন না, তার বদলে অন্যের উপর দোষচাপানো চালিয়ে যাবেন।

তবে দিদি, আমি একটা কথা বলে রাখি, যদিও আপনি সবটাই জানেন যে, হিংসা কেবল শাসক ও বিরোধীর মধ্যে নয়, শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও বহু হিংসার জন্ম দিয়েছে। অনেক মৃত্যু ডেকে এনেছে। পাঁচ বছর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসার স্রোত বয়েছিল রাজ্যে। সেবারও তৃণমূল দলের ভিতরের লড়াই বাইরে এসে গিয়েছিল। সেই ক্ষতে মলম লাগাতেই তৈরি হয়েছিল আপনার 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি। মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের পরিসর নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছিল। এবারও মনে হয় আপনি কিছু একটা করবেন। ওই যে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' বলে একটা কী করেছেন সেটাই হয় তো জাগিয়ে তুলবেন। কিন্তু দিদি, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েতের গোলমাল থেকেই রাজ্যে বদলের হাওয়া উঠেছিল। বিজেপির সাংসদ সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ১৮ হয়েছিল। আবার বিধায়ক সংখ্যা ৩ থেকে ৭৭ হয়েছে। আপনি গায়ের জোরে, ভয় দেখিয়ে কিংবা লোভ দেখিয়ে অনেককে টেনে নিয়েছেন নিজের দিকে কিন্তু দিদি ভোটারদের? তাঁরা তো আপনার হয়ে যায়নি। কৃষ্ণনগরে যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা কি আপনার?

গায়ের জোরে, ভয় দেখিয়ে কিংবা লোভ দেখিয়ে অনেককে টেনে নিয়েছেন নিজের দিকে, কিন্তু দিদি ভোটারদের? তাঁরা তো আপনার হয়ে যায়নি।

ভয় করছে দিদি, ভয়। দুর্নীতির পাহাড়ে বসে আপনি যে রক্তের খেলা খেলছেন তাতে আপনার একান্ত অনুগত ভাই হয়েও ভয় পাচ্ছি। রক্ত কিন্তু মাটিতে মিশছে। মাটি নরম করে দিচ্ছে।

রক্তে ভেজা বারুদ কি আরও শক্তিশালী হয়? জানি না।

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন

জোট বাঁধার পাটীগণিত

খুব বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিপদ আগামী ৯ মাসের মধ্যে না আছড়ে পড়লে ২০২৪ সালে আবার একটি অপ্রতাশিত ২০০৪ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে দল একার জোরে ২৭২ পার করবে কিনা সেটি দোলাচলে।

একা ২৭২ পেরিয়ে যেতে পারবে কিনা এটা নিয়ে পর্যালোচনার খেলায় হয়তো কোনো সংশয় থেকে বিজেপি ছোটো দলগুলিকে কাছে টানছে। বিরোধী পক্ষের কাজ কিন্তু আরও দুরূহ, এমনকী কংগ্রেস ১০০ আসন যদি ছাড়িয়ে যায়। দুই গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া মিটিং আমাদের সেই সংকেতই দিল যে কোনো জোটই হয়তো নিশ্চিত নয়। সেই কারণে জোট শরিক বাড়ানোতে শ্যেনদৃষ্টি।

এক্ষেত্রে দুটি জোটের মধ্যে একটি নজরে পড়া তফাত হচ্ছে শাসক বিরোধী জোটের লক্ষ্যটি কেবলমাত্র মোদীকে হটানো, বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত করা। সত্যিই দশ-দশটি বছর ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে থাকা এক ধরনের অবসাদগ্রস্ততা তৈরি করেছে বিরোধী দলগুলির মধ্যে। আর এটিই হলো হযবরল করে এখন মিশে যাও। কিন্তু এটিই একদিকে বিরোধীদের শক্তি আবার দুর্বলতার উৎসও বলে— হ্যাঁ, শক্তি সেটাই যেখানে বরাবরের পরস্পর ভিন্নমুখী দলগুলির এক ছাতায় ঢোকা। আর এর বিপরীতে রয়েছে সংকীর্ণ একটি উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত এমন একটা জোটের পক্ষে যেতে, মোদীর ওপর গভীর আস্থাবান নাগরিকদের তাঁকে দুম করে পরিত্যাগ করে আসার অনীহা।

এক্ষেত্রে বিরোধীদের সেরা আশা হচ্ছে ২০০৪-এর নির্বাচনী ফলাফল, যখন কেবলমাত্র বদলে দিতে হবে এই মানসিকতা নিয়ে কোনো আদর্শগত মানসিকতার অভাব বা কোনো নির্দিষ্ট জোট নেতার আগমন আদৌ বিবেচিত হয়নি। কিন্তু বিজেপির পক্ষে ছোটো দলগুলিকে কাছে টানা কেবলমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখার কারণে নয়। মোদীর নেতৃত্বে দলের যে নির্ভরতা ও নিশ্চিন্ততা তাতে নবাগতদের নিয়েও কাজ করা যাবে। কিন্তু মোদী বিহনে এক শূন্যতা ঘিরে ধরতে পারে। ২০২৪-এর নির্বাচন বিজেপির জেতা দরকার, কেননা বিগত দশকে যে কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে বা যে বিশাল বিশাল কর্মকাণ্ডগুলি এগিয়ে চলেছে এবং তার ফলে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লাভ হয়েছে তাকে সুসংহত করা। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ক্ষমতা হারানো ২০০৪-এর মতো পরিস্থিতি ডেকে আনবে।

দলের আদিপন্থীরা হিন্দুত্বের অগ্রগতি নিয়ে ইতিমধ্যেই অধৈর্য কিন্তু ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনে তাদের লক্ষ্যপূরণে আশা বেঁচে থাকবে এই কারণে তারা শোরগোল করছে না শুধু নয়, দলের মধ্যে এটা নিয়ে সকলেই চিন্তিত যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে গতি দেশকে বলীয়ান করে তুলছে হঠাৎ পদচ্যুত হলে আগামীদিনে যে উন্নতির ফলাফল দেশ আরও পাবে, তার সবই হঠাৎ ক্ষমতা জয়ীরা সবই নিজেদের কীর্তি বলে ধরে নেবে। যেমনটা ২০০৪-১৪ তারা মেঘ না চাইতেই জলের ফল পেয়েছিল। আরও একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে ২০২৪-এর মে মাসের নির্বাচনী ফলাফলের পর পরিস্থিতি দেখে এনডিএ বা ইন্ডিয়া উভয় জোটে কুঁচোকাঁচা অংশগুলি কে কোনদিকে থাকবে এখন থেকে নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

এই জায়গাটাতেই বিজেপির কিছুটা সুবিধে আছে। যদি আমরা মেনে নিই যে মোদীর নিজস্ব একটা বিশাল আবেদন আছে সেক্ষেত্রে দলের আসন ২৩০-২৫০-এর নীচে নামা কঠিন। এই কারণের ইঙ্গিত ছোটো ছোটো দলগুলির বিজেপির খাঁচায় ঢোকা থেকে বোঝা যায়। তারা জানে এদিকে লাভবান হওয়া যাবে আর নিজ নিজ রাজ্যে বাড়তি ক্ষমতাবানও হওয়া যাবে।

এখন বিজেপির ন্যূনতম আসন পাওয়ার যুক্তিটা বেশ সরল। ২০১৯-এর নির্বাচনে ২১৮টি হিন্দি বলয়ের আসনে দল ১৯৬টি আসন জিতেছিল। অবশ্যই এবারে বিহার কিছুটা ক্ষয়, মধ্যপ্রদেশে আসন সংখ্যা একটু কমা, আবার ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে প্রায় সম পরিস্থিতি থাকলেও সেখানে দল গতবার ব্যাপক আসন জিতেছিল। তাই ১৯৬ থেকে কমে ১৫০ সংখ্যার আসন জয় ধরে নেওয়া যায়।

অন্যদিকে ৫টি বড়ো অ-হিন্দি রাজ্য

(মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, পঞ্জাবে) ১৫০টি আসনের মধ্যে দল গতবার ৮০টি জিতেছিল। এবারে মহারাষ্ট্রে ও পশ্চিমবঙ্গে জয়ী আসনের সংখ্যাটা ৬০-এর নীচে নামার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না (দলের জোট সঙ্গীদের নিয়ে), আবার দক্ষিণে যেখানে মোট ১৩০টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসনের মধ্যে দল ৩১টি জিতেছিল যার মধ্যে কর্ণাটকে বড়ো জয় পেয়েছিল। এই ৩১-এর সংখ্যাটা ধরে রাখা যাবে। কর্ণাটকে জয়ী আসন কমলেও দক্ষিণের বাকি বড়ো চারটি রাজ্য থেকে কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে। পড়ে থাকবে ৪৩টি আসন। এগুলি হলো দিল্লি, জম্মু কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ২৯। দলের কাছে এমনো কোন যুক্তি নেই যাতে মনে হতে পাবে এগুলি তারা পাবে না অর্থাৎ ধরে রাখতে পারবে না।

আলোচিত সংখ্যাগুলির যোগফল করলে দেখা যায় বিজেপি ২৭২-এর আকাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটির প্রায় নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছে। সে একাই হোক বা জোটসঙ্গীদের নিয়েই হোক। এর থেকে বোঝা যায় এই ছোটো দলগুলিকে ম্যানেজ করা বাস্তবে তৃণমূল বা ডিএমকের চেয়ে অনেক সহজ। কেননা এই দুটি দলের রাজ্যভিত্তিক সমর্থন প্রবল। তবে আর একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিত প্রয়োজনের সময় অন্ধ্রের YSR কংগ্রেস এবং ওড়িশার বিজেডির কৌশলগত সমর্থন দল আশা করতেই পারে। আজকে বাস্তবে যেখানে এনডিএ-র কিছুটা পুনরুত্থান হচ্ছে যেখানে দল যদি একা ২৭২-এর কাছাকাছি আটকে যায় সেক্ষেত্রে বড়ো প্রাদেশিক দলের হম্বিতম্বি থেকে ছোটো দল অনেক সহজে সমর্থনে আসবে।

বিরোধীদের সম্মিলিত বাহিনী গঠিত হয়েছে ফলাফলে কংগ্রেস ১০০-র বেশি আসন পেলেও সেখানে সকলে সমর্থন করছে এমন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো দল পাওয়া কঠিন।

এবার বিজেপির তরফে আর একটা সুবিধের কথা বলা দরকার। তার অপেক্ষাকৃত বড়ো জোট সহযোগী দল (অজিত পাওয়ারের এনসিপি কিংবা চন্দ্রবাবুর তেলুগু দেশম বা এআইএডিএমকে)-এর নেতারা বিজেপিকে লোকসভায় তাদের প্রভাবিত আসন বেশি ছাড়তে পারে। তুলনায় তারা বেশি আসন নেবে বিধানসভাগুলিতে। এই সূত্রে অজিত পাওয়ার তো সহজ ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন যে তিনি আজীবন বিধানসভায় ২নং থাকতে ইচ্ছুক নন। মহারাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে সংখ্যায় বড়ো দল হয়েও বিজেপি শিবসেনা (শিন্ধে) ও অজিত পাওয়ারকে যথেষ্ট রাজ্যস্তরে জায়গা দিয়েছে। ২০২৪-এর বিপরীতে লোকসভায় তারা বিজেপিকে বেশি আসন দেবে এমনটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক। এর বিপরীতে ছোটো জাতীয় বা রাজ্যস্তরের দলগুলি সে তৃণমূলই হোক বা আপ বা সমাজবাদী দল কখনই কংগ্রেসকে বাড়তি জায়গা ছাড়বে না কেননা তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওই আসনগুলির ওপরেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-এ বিজেপি ছোটো দলগুলিকে নিজেদের (বিজেপির) শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু বড়ো রাজ্যস্তরের দলগুলি কখনই নিজেদের স্বার্থের বিনিময়ে কংগ্রেসকে big daddy হতে দেবে না। খুব বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিপদ আগামী ৯ মাসের মধ্যে না আছড়ে পড়লে ২০২৪ সালে আবার একটি অপ্রত্যাশিত ২০০৪ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে দল একার জোরে ২৭২ পার করবে কিনা সেটি দোলাচলে। □

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ- ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুট এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন-প্রাণায়াম-মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাজ (যোগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল : ১ বছর। ৩০ জুলাই থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা : ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস : প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

1977
স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi -, Govt,. of India

কোর্স ফি : ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা।
ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস : ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ২৯
9051721420 / 9830597884/9836522503

দেশের নামে বিরোধীদের জোট
ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র বদল করেছেন মোদী

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ও ভারতীয় সংসদ-ভবন হামলার মূলচক্রী আফজল গুরুকে 'শহিদে'র মর্যাদা দিয়ে তার জন্মদিন পালন। এবং সেই সমাবেশে বিরোধী দল কংগ্রেসের একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে রাহুল গান্ধীর সক্রিয় সমর্থন ভারতবর্ষ দেখেছে। এও দেখেছে, ২০১৯-এ পুলওয়ামায় অতর্কিত জঙ্গি আক্রমণে চল্লিশ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হলে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের বালাকোটে বোমা নিক্ষেপ করে জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দেয়। তারপরে ভারতবাসী অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এদেশের কিছু রাজনৈতিক দল বোমায় সন্ত্রাসবাদীরা নয়, পাখি মারা গেছে বলে চেঁচিয়েছিল।

নরেন্দ্র মোদীর জমানায় গত নয় বছরে এমনতর বহু ঘটনা দেখা গিয়েছে, যেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেশের স্বার্থ বিরোধী কথা বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশদ্রোহিতার কাজ করা হয়েছে, আর এই দেশদ্রোহিতাকেই মানবাধিকারের দৃষ্টিতে দেখে তাকে সমর্থনও করা হয়েছে। ভারতের বিরোধী রাজনীতির এই চরিত্র কবে পালটাবে বা আদৌ পালটাবে কিনা তা বলা মুশকিল, তবে আর কিছু না হোক এই সমস্ত প্রগতিশীলতা সরিয়ে রেখে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ দেখাতে বিরোধী জোটের নামকরণ হয়েছে ইন্ডিয়া যার পুরো নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। এটা যে ভেক, লোকদেখানো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও বিরোধীরাও, বিশেষ করে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলিও যে দেশের নামে রাজনীতি করতে পারে, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী না হলে সত্যিই বোঝা যেত না।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা মাঝেমধ্যেই একটি উপমা বলে থাকেন যে 'বেড়াল ঠেলায় না পড়লে গাছে ওঠে না'। কাকতালীয়ভাবে, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ এরাজ্যের শাসকদলের মাথা থেকেই দেশের বিরোধী জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' বেরিয়েছে।

তারা ঠেলায় পড়েছে বিলক্ষণ, পাহাড়প্রমাণ আর্থিক দুর্নীতির চাপে তাদের দমবন্ধ অবস্থা। কিমাশ্চর্যম! এদেশের কমিউনিস্টদেরও অবস্থা বিজেপির আদর্শগত চাপে অতি শোচনীয়, তাই চিরাচরিত পার্টিলাইন থেকে সরে তারাও 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' ভুলে ইন্ডিয়ার ছাতার তলায় শামিল। আসলে সব বিরোধী দলের একই অবস্থা, লোকসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে, তত তাদের ধড়ফড়ানি (প্যালপিটেশন) বাড়ছে, আগের দুবারের (২০১৪ ও ২০১৯) কথা মাথায় রেখেই হয়তো বা। ফলে ঠেলায় পড়ে তাদেরকেও গাছে উঠতে হচ্ছে, অর্থাৎ দেশপ্রেমের রাজনীতি আমদানি করতে হচ্ছে।

মোদী সরকারের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব কী? তার বিচার একমাত্র সময়ই করতে পারবে। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, জাতীয় রাজনীতির এই যে চরিত্র বদল, এটাই মোদী সরকারের বোধহয় সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। গত শতকের সাতের দশকে কংগ্রেস নেতা জরুরি অবস্থার সময় সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি ডিকে বড়ুয়া একদা স্লোগান তুলেছিলেন, 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা'। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে তৎকালীন ভারতের সর্বময়ী কর্ত্রী, একনায়কতন্ত্রী শাসক হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ইঙ্গিত ছিল। তারপরেই জরুরি অবস্থা জারি করে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল। বলা বাহুল্য, গান্ধী নেহরু পরিবার যতদিন ভারতের শাসন ক্ষমতায় ছিল, তাদের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী মনোভাব কোনোদিন দেশপ্রেমের রাজনীতির জন্ম দিতে পারেনি।

একথা ঠিক দেশপ্রেম আর যাইহোক, কখনো রাজনীতির বিষয়বস্তু হতে পারে না। কিন্তু ভারতে এই বিষয়টি অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে কারণ ভারতীয় রাজনীতির অতীতে সাক্ষ্য রয়েছে চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি ভারতীয় শত্রুদের নাম নিয়ে রাজনীতি করার। তার বিপক্ষে তো দেশপ্রেমের রাজনীতির প্রশ্ন উঠবেই অনিবার্যভাবে। ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে জরুরি অবস্থার পরবর্তীতে প্রতিরোধ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অটলবিহারী বাজপেয়ী- লালকৃষ্ণ আডবানীর আমলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ গঠন করে কংগ্রেসী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোট রাজনীতি নিয়ে এসে ভারতীয় রাজনীতির চালচিত্রটাই বদলে দিয়েছিল। সেই পথ ধরেই ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরে কংগ্রেস ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স বা ইউপিএ গড়ে জোট সরকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

এর আগে কংগ্রেস যতবার নিরুপায় হয়ে ছোটো দলকে সমর্থন করে কেন্দ্রের সরকারে গিয়েছে বা বাইরে থেকে সমর্থন করেছে, কিছুদিন পর তাদের ফেলে দিয়ে অকাল নির্বাচনের বোঝা ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপিয়েছে ও আবার এককভাবে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। যেমন ১৯৯৬ সালে স্বল্পস্থায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া ও ইন্দর কুমার গুজরালের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে সরকার ফেলে দিয়েছিল দিয়েছিল কংগ্রেস। □

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বামেদের তৃণমূল বিরোধিতা লোক-ঠকানো গিমিক মাত্র

জাতীয় রাজনীতির রৌদ্রোজ্জ্বল দুর্নীতিমুক্ত দিগন্তকে ম্লান করে তুলে সেখানে তিমিরময়ী রাত্রির স্তব্ধতা আনতে চান এঁরা এবং একইসঙ্গে অত্যন্ত সুকৌশলে এই রাজ্যের জনসাধারণের মানসপট থেকে তৃণমূলের অসহনীয় দুর্নীতিকেও ঝাপসা করে তুলতে চাইছে এই অশুভ জোট।

ড. তরুণ মজুমদার

এ রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে তৃণমূলের সর্বগ্রাসী চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্রমশ সোচ্চার হয়ে পথে নামছেন। ফলস্বরূপ অজস্র বিজেপি কার্যকর্তার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও বাম সমর্থক কর্মীদের উপরও প্রাণঘাতী আক্রমণ নেমে আসছে। একের পর এক মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন। সিভিল ও পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নির্লজ্জ দলদাসত্ব পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়নের প্রথম দিনেই মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ শেখকে তৃণমূলি হার্মাদ বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। হরিহরপাড়া ব্লকের নিয়ামতপুর গ্রামে তৃণমূলি জল্লাদদের হাতে আক্রান্ত হয়ে সিপিআইএম কর্মী রিন্টু শেখ মারা যান। রাজ্যে যখন এই সার্বিক অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা একের পর এক খুন হচ্ছেন, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে ১৮ জুলাই ব্যাঙ্গালুরুতে কংগ্রেস, সিপিআইএম, তৃণমূল-সহ ছাব্বিশটি রাজনৈতিক দল একসঙ্গে জোট রাজনীতির বিরিয়ানির মশলা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আনিসের হত্যার পর যারা ইনসাফ সভার আয়োজন করেছিল, আজ তারাই আনিসের হত্যাকারীদের সঙ্গে আলিঙ্গনের রোমান্টিকতায় মত্ত। ফুলচাঁদ শেখ, রিন্টু শেখদের পরিবারের লোকেদের সামনে এরপর কংগ্রেস বা সিপিআইএম নেতারা মুখ দেখাতে পারবেন কী না জানি না। তবে কর্মীদের আত্মত্যাগের সঙ্গে এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা এর আগেও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসাদলোভী বাম ও কংগ্রেস নেতারা বারবার করেছেন।

রাজনীতির আঙিনায় অনামি, অচেনা, অনভিজ্ঞ শ্রীজীব বিশ্বাসকে তড়িঘড়ি মমতা ব্যানার্জির মতো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়া করানোর যৌক্তিকতা ঠিক কী? তিনি কি রাজনীতিতে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন? সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, এ রাজ্যের অতি বড়ো বামপন্থী ক্যাডারও হয়তো তাকে চেনেন না। ২০২১ সালে ১৯৫৬ ভোটে নন্দীগ্রাম বিধানসভা থেকে হেরে যাওয়ার পরও যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন তখন ছ' মাসের মধ্যে তাঁকে বিধানসভায় উপনির্বাচনের মাধ্যমে জিতে আসতেই হতো। এমতাবস্থায় সব থেকে নিরাপদ সিট তার জন্য চয়ন করা হলো। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ইস্তফা দিলেন। মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল রাখার জন্য তৃণমূলের তৎকালীন গড় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হলো। জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী না দিয়ে ওয়াকওভার দিয়েছিল। ভোট পরবর্তী নারকীয় হিংসায় সে সময় বিজেপির আপামর কার্যকর্তাদের মনোবল তলানিতে ঠেকার কারণে বিজেপির পক্ষে এই বাই-ইলেকশনে সাফল্য লাভের আশা একেবারেই ছিল না বললেই চলে। অথচ এই সিপিএম-ই কিন্তু ২০২১-এর সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের পার্টির নতুন প্রজন্মের অত্যন্ত চেনা মুখ কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জিকে নির্বাচনী টিকিট দিয়ে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারণ ছিল সেই মমতা ব্যানার্জি। পূর্ব মেদিনীপুরের তৎকালীন জনপ্রিয় নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভোট কেটে মমতা ব্যানার্জির জয় সুনিশ্চিত করাই ছিল সেদিন সিপিআইএমের একমাত্র লক্ষ্য।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস 'পরিবর্তন চাই' স্লোগান তুলে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিধানসভায়

সিপিআইএম বিরোধী আসনে বসে। বিধানসভায় কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্র সেদিন বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১১ থেকে ২০১৬ এই পাঁচ বছরে সূর্যকান্ত মিশ্রের নেতৃত্বে রাজ্যবাসী একটিও গণআন্দোলন প্রত্যক্ষ করেননি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে এই পাঁচ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা ছিল বা কোনোরকম দুর্নীতি সেই সময় তারা করেনি? বাস্তব কিন্তু এর উলটো কথাই বলছে। অর্থাৎ সেদিন সিপিআইএম সেটিং অপোজিশনের কাজ করে গেছে। নবান্নে ফিশফ্রাই মিটিঙে রচিত হয়েছিল এই সেটিং রাজনীতির রূপরেখা। কলকাতার বুকে আনিসের মৃত্যুর প্রতিবাদে ইনসাফ সভা ডাকা হয়েছিল বেছে বেছে ঠিক সেই তারিখেই যেদিন উর্দুর পরিবর্তে বাংলা পড়তে চেয়ে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল দাড়িভিটের রাজেশ আর তাপসের। অর্থাৎ বামেরা সুকৌশলে সমাজ-মনন থেকে দাঁড়িভিটের ভাষা বলিদানীদের নাম মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা চালালো আর তাতে যোগ্য সঙ্গত করলো তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত ইনসাফ সভায় সম্পূর্ণ পুলিশি সুরক্ষায় একটার পর একটা মিছিলের সভাস্থলে আগমন অথচ এই রাজ্য পুলিশই ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের প্রত্যেকটি রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলে বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও চূড়ান্ত হেনস্থা করল যাতে ১৩ সেপ্টেম্বর বিজেপির ঘোষিত নবান্ন যাত্রা বিফল করে দেওয়া যায়। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার সাঁইবাড়ির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত তদন্ত করার জন্য বিচারপতি অরুণাভ বসুর নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। আজও সেই কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে কেন আনা হলো না? একইভাবে বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন একুশে জুলাই কমিশনের রিপোর্ট বা বিচারপতি অমিতাভ লালার নেতৃত্বাধীন বিজন সেতু হত্যাকাণ্ড কমিশনের রিপোর্ট কেন চেপে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার? খুনি কমিউনিস্টদের আড়াল করার এই উদগ্র বাসনা কেন? বিগত বিধানসভায় (২০১৬-২০২১) পনেরোটি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বাম এবং কংগ্রেসের বিধায়কেরা, অথচ এই বিধানসভায় বিজেপির একজন বিধায়ককেও কোনো স্ট্যন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি। রাজ্যে বিরোধী দল হিসেবে বিজেপিকে ম্যানেজ করা যাচ্ছে না বলেই কি এই নির্লজ্জতা?

পরবর্তী পাঁচ বছরে জাতীয় কংগ্রেসও একই কায়দায় অন্দোলন বিমুখ হয়ে সেটিং রাজনীতিতে নিজেদের বিরোধী সত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। ২০১৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভিকে এই রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেস রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করে। প্রতিদানে কপিল সিব্বাল, অভিষেক মনু সিংভির মতো জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় হেভিওয়েট নেতৃত্ব দিনের পর দিন কখনো হাইকোর্টে বা কখনো সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূলের সর্বগ্রাসী চৌর্যবৃত্তির পক্ষে দিনের পর দিন ধরে সওয়াল করে চলেছেন। এই দেউলিয়াসর্বস্ব ক্ষমতালোভী রাজনীতির প্রথম সার্বিক বহিঃপ্রকাশ ঘটল পাটনায় ২৩ জুন, যেখানে চুরির দায়ে জেল খাটা অপরাধী লালুপ্রসাদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস, সিপিআইএম, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ আরও কয়েকটি আঞ্চলিক দল জাতীয় রাজনীতিতে জোটবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে দুর্নীতি মুক্ত সরকার গড়ার শপথ নিচ্ছে। অর্থাৎ জাতীয় রাজনীতির রৌদ্রোজ্জ্বল দুর্নীতিমুক্ত দিগন্তকে ম্লান করে তুলে সেখানে তিমিরময়ী রাত্রির স্তব্ধতা আনতে চান এঁরা এবং একইসঙ্গে অত্যন্ত সুকৌশলে এই রাজ্যের জনসাধারণের মানসপট থেকে তৃণমূলের অসহনীয় দুর্নীতিকেও ঝাপসা করে তুলতে চাইছে এই অশুভ জোট। দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন মানুষ সবকিছুই প্রত্যক্ষ করছেন। রাজনীতি নিয়ে খোঁজখবর রাখা কিছু মানুষ কয়েক ধাপ এগিয়ে এরই মধ্যে স্লোগান তুলছেন, 'আর নয় একা একা চাল চুরি; সঙ্গে আছে কংগ্রেস আর ইয়েচুরি।' ষড়যন্ত্রকারী সেটিং রাজনীতির প্রবর্তক বাম ও কংগ্রেসকে যেভাবে এ রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক ভাবে বিসর্জন দিয়ে শূন্যে নামিয়ে এনেছেন; ঠিক একইভাবে সর্বগ্রাসী চৌর্যবৃত্তিতে অভিযুক্ত তৃণমূলও দিগ্‌বলয়ে বিলীন হবে। শুধু কিছুটা সময়ের অপেক্ষা।

With Best Compliments from -

A Well wisher

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গের ঘুরে দাঁড়ানো খুব কঠিন নয়

সুদীপ্ত গুহ

আগের লেখায় আমি বিশ্লেষণ করেছিলাম কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং ঘুরে দাঁড়ালে কীভাবে উত্তর ভারত এবং উত্তরপূর্ব ভারত লাভবান হবে। কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন সেই বিষয়েও আলোচনা করেছিলাম। এর ফলে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব পাবে তাঁদের বাণিজ্য রাজধানী। আমেরিকা-সহ বহু পাশ্চাত্য দেশ চাইছে, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে এবার ভারতে বিনিয়োগ করতে। যাতে চীনের উপর তাঁদের নির্ভরতা কমে। বিনিয়োগের মধ্যে মূলত মোটর গাড়ি, বিমান নির্মাণ, রাসায়নিক শিল্প, ইলেকট্রনিক পণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ধাতু, খনি, ওষুধ, নবায়নযোগ্য শক্তি, টেলিকম, বস্ত্র ও হোয়াইট গুডস। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত এতদিন স্বাভাবিক পছন্দ। কিন্তু এবার উঠে আসছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অসম। পশ্চিমবঙ্গ এখানে দুটি বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারতো, যার জন্য খুব বেশি জমি প্রয়োজন হতো না, খুব বেশি বিনিয়োগ দরকার হতো না এবং খুব বেশি করছাড় দিতে হতো না।

(১) উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড়ো জলপথ গঙ্গা। গঙ্গার মোহনায় একটা বড়ো গভীর সমুদ্র বন্দর থাকলেও তা গঙ্গা অববাহিকার দুই পাশে কম করে ২০০টি রপ্তানিভিত্তিক শিল্পনগরী হতে পারতো। কলকাতা হতো রপ্তানি হাব। উত্তর ভারতে রপ্তানি করতে হলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুবিধা এই জাতীয় জলপথ-১ দিয়ে। এলাহাবাদ থেকে নবি মুম্বাইয়ের জেএনপিটি বা ওড়িশার ধামড়া বন্দরে স্থলে বা রেলে পণ্য পাঠাতে যা খরচ, তার চেয়ে কিন্তু অনেক কম খরচে তারা হলদিয়া বা তাজপুর বন্দরে পাঠাতে পারে তাঁদের পণ্য। আগামীদিনে নবায়নযোগ্য

শক্তি উৎপাদনে ভারত এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যে এই খরচ ভীষণ কম হয়ে যাবে। তাই খুব কম সময়ে তৈরি করে ফেলতে হবে তাজপুর বন্দর। এই বন্দর তৈরি হলে উত্তর ও মধ্যভারতকে যুক্ত করতে হবে সড়ক, জল ও রেল পথে, যাতে ওই রপ্তানিভিত্তিক শিল্পনগরী বানানো যায়।

(২) আজকের দিনে যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিঙে একটা বড়ো অংশ থাকে পরিষেবা। অ্যাপল আই ফোন হোক বা টাটার গাড়ি, সেখানে সফটওয়ার-সহ বিভিন্ন পরিষেবার ভাগ প্রায় ৫০ শতাংশ। বাকিটা বিশুদ্ধ উৎপাদন থেকে। এখানে এই পরিষেবার দিকে আমাদের ঝুঁকতে হবে। এখানে পশ্চিমবঙ্গবাসীর শক্তি ও দুর্বলতা একবার বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ সিঙ্গুর। সিঙ্গুর নিঃসন্দেহে একটা ভালো উদ্যোগ ছিল এবং কিছুতেই সেটা হারানো আমাদের উচিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাঙ্গালি কেন সিঙ্গুর থেকে টাটার চলে যাওয়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিল? টাটাকে তাড়ানোর জন্য তো সেবার তৃণমূলের হারার কথা। উলটে ৩২ বছর পর কেন সিপিএম সরকার প্রথমবার কোনো বড়ো উদ্যোগ শুরু করতে যেতেই, ভেঙে পড়লো তাসের ঘরের মতো ২০০৯ লোকসভা ভোটে? বাঙ্গালি অলস? আত্মঘাতী? নাকি পিছনে আছে অন্য মনস্তত্ত্ব? এই ব্যাপারে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। নব্বইয়ের দশকে যখন গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষর হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের উৎপাদন পাঠিয়ে দেয় চীনে। গবেষণা কিংবা ডিজাইন তাঁদের হাতে থাকার পরেও কেন তারা চীনে বিনিয়োগ করল? তারা তো নিজের দেশে এই বিনিয়োগ করলে সারা পৃথিবী তাদের হাতে চলে আসতো? না, আসতো না। এক, ওঁদের দেশের মানুষ চীনাদের মতো পরিশ্রম করতে পারবে না। দুই, তাঁদের মাইনে অনেক বেশি। তাঁদের দেশের মানুষ যদি অ্যাপল আই ফোন তৈরি করতো, তার উৎপাদন খরচ এতো বেশি হতো, যে ক্রেতা পাওয়া যেত না আন্তর্জাতিক বাজারে। তিন, মার্কিনিরা ওই কাজ করতোই না। সারা পৃথিবী থেকে লোক নিয়ে আসতে হতো কাজের জন্য। সিঙ্গুরেও একই ঘটনা ঘটে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি নিজের কোনো কাজ টাটার সিঙ্গুর কারখানায় খুঁজে বের করতে পারেনি। ওই কারখানার কাজ করতে আগ্রহী ছিল না বাঙ্গালি। এখানেই আমাদের চিন্তা করতে হবে বিকল্প পথের, যা আমাদের সমাজ, আমাদের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়। আমাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। আর সেখানেই আসছে পরিষেবা শিল্পকে গুরুত্ব দেবার ব্যাপার। উৎপাদন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও নকশাকেন্দ্র হতে পারে জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, দুর্গাপুর,

খড়্গপুর বা কলকাতা। আই ফোন, স্মার্ট টিভি, চিপ, ফ্রিজ থেকে গাড়ি প্রতিটি ক্ষেত্রেই গড়ে ৫০ শতাংশ পরিষেবার ভাগ। এই শিল্প তৈরি করতে হবে এখানে।

(৩) কৃষি পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণ পালটে ফেলতে হবে। ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও তিস্তা প্রকল্প শেষ করে প্রতিটি চাষের জমিতে জল পাঠাতে হবে। সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর- গন্ধেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী-নুনবিল নতুন করে শুরু করতে হবে। এছাড়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া দার্জিলিঙের ৩০-এর বেশি বন্ধ বা আধা শেষ হওয়া সেচপ্রকল্প চালু করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? প্রথমত, সেচ, ক্ষুদ্রসেচ এবং জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি দপ্তরকে একত্রীকরণ করতে হবে। তারপর প্রতিটি বেসিনে একটি কর্পোরেশন বানাতে হবে। যেমনটি কয়েকদশক আগেই কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র বা গুজরাট করেছে। বিপুল অর্থ আনতে হবে বিশ্বব্যাংক বা এই ধরনের সংস্থা থেকে। আনতে হবে নতুন প্রযুক্তি। দরকারে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ তৈরি করতে হবে। কিন্তু যা আরও বেশি দরকার তা হলো বাজার। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রির সুযোগ দরকার। কৃষককে সরাসরি বেসরকারি বড়ো বাবাসায়ীকে বিক্রির সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। তৈরি করতে হবে সমবায়। কৃষি কাজ এবং বাজার দুটোর জন্যই।

(৪) স্বাধীন পরিষেবা ব্যবসা। উৎপাদন ক্ষেত্রের সহযোগী হাওয়া ছাড়াও আরও কিছু এমন পরিষেবা ক্ষেত্রে দরকার, যেখানে শিক্ষিত বাঙ্গালি কাজ করতে পারে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা বা পরামর্শদাতার কাজ। কিছু বিমানবন্দরভিত্তিক পরিষেবা কেন্দ্র প্রয়োজন। ধরা যাক কোচবিহার, বালুরঘাট ও অন্ডাল। এখানে ইউনিভার্সিটি, মেডিসিন বা গবেষণাকেন্দ্র বানানো যায়। যেমন আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৃতীয় বিশ্বের বহু ধনী ব্যক্তি জন হপকিন্স বা সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন ডাক্তার দেখাতে। এই ধরনের হাসপাতালকে যদি ঠিক মতো প্যাকেজ দেওয়া যায়, তবে এঁরা কোনো একটা বিমানবন্দরের কাছে তাঁদের সেন্টার খুলতে পারে। সেক্ষেত্রে আজ যেমন উৎপাদন ক্ষেত্রে পিএলআই দেওয়া হচ্ছে, তেমনি কিছু দিতে হবে। এই একই সূত্র শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(৫) শক্তি ক্ষেত্রে প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাকে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্য রাখতে হবে। নাগপুরে নর্দমার জল থেকে জ্বালানি তৈরি করে বাস চালানো হচ্ছে। টোটো বা ছোটো মালবহনকারী গাড়ির মতো হালকা গাড়িতে এই জ্বালানি কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ওই গাড়ির মেরামতের কেন্দ্র থাকবে এবং ওই জ্বালানি তৈরির কারখানা। প্রতিটি বাড়ি, দোকান, কৃষি, সেচ বা হিমঘরে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে যে অর্থ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি পায়, তা পাবে গ্রামের শিক্ষিত মানুষ। যে জ্বালানি তেল কিনতে গ্রামের টাকা আরবদেশে যায়, তা গ্রামের বাজারেই মিলবে।

(৬) প্রতিটি গ্রামে একটি কম্পিউটারাইসড সাধারণ সরকারি পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। যেমন আয়কর বা পাসপোর্ট ক্ষেত্রে করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, ভূমি, কৃষি বিপণন থেকে পঞ্চায়েত, সেচ, জল সব ক্ষেত্রে কাউন্টার হবে একটাই। একটাই জানালা। বহু গ্রামের শিক্ষিত মানুষ কাজ পাবে এবং কমবে দুর্নীতি।

(৭) শিক্ষা রপ্তানি। রাজ্য থেকে মেধাপাচার হয়ে গেছে। যার ফলে আজ স্কুল শিক্ষা নিতেও যেতে হয় কোটা, হায়দরাবাদ বা দিল্লিতে। কলকাতায় প্রচুর শিক্ষক আছেন। কিন্তু প্রযুক্তির অভাবে তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছেন Unacademy বা Physicswala-র কাছে। এখানে সরকারকে প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সাহায্য করে সেরা মেধাকে নিয়ে যেতে হবে বিশ্বের বাজারে।

(৮) সংস্কৃতি : যীশু সেনগুপ্ত, স্বস্তিকা মুখার্জিদের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আজ মুম্বাই বা হায়দরাবাদে চলে যাচ্ছেন। তেলুগু, তামিল, কন্নড়রা তাঁদের সিনেমা বাংলায় ডাব করে আমাদের বিক্রি করে যাচ্ছেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাংলা সিনেমার প্রতি আস্থা হারিয়েছে। কারণ সংস্কৃতিগজতের রাজনীতীকরণ। সোভিয়েত রাশিয়া বহুদিন আমাদের সংস্কৃতি জগৎকে দখল করার চেষ্টা করেছে। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর পুরো দখল নেন জ্যোতিবাবুরা। এরপরে দখল নেয় জেহাদিরা। একের পর এক শুরু হয় লাভ জিহাদ ভিত্তিক আজগুবি ছায়াছবি। বাংলা সিনেমাকে প্রত্যাখ্যান করে নীরব প্রতিবাদ করে বাঙ্গালি। শেষ হয়ে যায় বাংলা সাহিত্য, কবিতা, নাটক, যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, গান। আজও টালিগঞ্জ থেকে বাজারি, পত্র-পত্রিকায় রাজত্ব করছে এই বামপন্থী জিহাদিরা। এঁদের হাত থেকে মুক্তি পেলে খুব তাড়াতাড়ি আবার উত্তমকুমার যুগ ফিরে আসবে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে। কম করে ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান দিতে পারে এই শিল্প। বছরে ১০০০০ কোটির ব্যবসা দিতে পারে শুধুমাত্র সংস্কৃতি জগৎ।

উপরের প্রস্তাব অতি-ইতিবাচক মনে হতে পারে। কিন্তু গত চার দশকে আমাদের রাজ্য থেকে পাশ করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা মেধাকে যদি এক ছাতার তলায় আনা যায়, তাহলে মাত্র পাঁচ বছরে বড়ো পরিবর্তন সম্ভব। পাঁচ দশকের ছদ্মবাম, বাম এবং বিভ্রান্তবাম রাজনীতির ফলে মানুষ আস্থা হারিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ কোনোদিন আর ঘুরে দাঁড়াতে পারে। সারা ভারত আশির দশকে এইভাবেই নেতিবাচক ভাবতো। কিন্তু পিভি নরসীমা রাও এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী মাত্র এগারো বছর রাজত্ব করে আধুনিক ভারতের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু পরের দশ বছর আবার পতন শুরু সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে। আমাদের তো পাঁচ দশক একই ভাবে চলছে। এখন তো দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তবু পশ্চিমবঙ্গেরও ঘুরে দাঁড়ানো খুব সহজ। দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দ্রুত আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার এবং সঠিক মানবসম্পদ নির্বাচন। □

পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংসের কারিগর আপনারাও বুদ্ধবাবু

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

দাবি করা হয় এবং তা সত্যি, যে সিপিএমের প্রথম দিকের নেতারা ব্যক্তিগতভাবে খুব সৎ ছিলেন। তখন এঁদের জীবনযাপন সততার ইঙ্গিতবাহী ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত সততা আর সমষ্টিগত সততার মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। যে দলের ক্ষমতায় এঁরা খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও পদ লাভ করেছেন সেই পার্টির অসততা এঁদের অবশ্যই কালিমালিপ্ত করে! সততার নিরিখে এদের নম্বর দিলেও পাশমার্ক দেওয়া যাবে না। পার্টির সামগ্রিক অর্জনের খতিয়ান দেখলেই তা পরিষ্কার হবে।

১। বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে ভোটপ্রচারে জোরালো ডাক দিয়েছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব করবে বলে। তারা রাজ্যের গরিবস্য গরিবদের বেশি সুবিধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল অথচ শিল্প দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এক দপ্তরের দায়িত্ব অর্পণ করেছিল ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কানাইলাল ভট্টাচার্যকে। অন্যদিকে সিপিএমের তাবড় নেতারা শক্তি, শ্রম, ভূমি এবং ভূমি সংস্কারের মতো দপ্তরগুলো নিজেদের কাছে রেখেছিল। শিল্প অগ্রাধিকার তালিকাচ্যুত হওয়ায় তার অভূতপূর্ব অধঃপতন হয় এবং জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নবাদ পুঁজির পলায়ন ঘটায়। এটা ১৯৯৩ পর্যন্ত চালু থাকে যখন বামপন্থীরা নতুন অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে আসে। তবুও ২০০৬-এর আগে রাজ্য কোনো হেভিওয়েট নেতাকে শিল্পমন্ত্রী করেনি। লাগাতার অনর্থক কর্মীবিশৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও আচরণবিধি ভঙ্গ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অমান্য, অপদস্থ ও চরম অবমাননা, নাশকতা, ফাঁকিবাজি ও দুর্নীতি এ রাজ্য থেকে শিল্পের পলায়ন নিশ্চিত করে। সবসময়ে এরা বলতো মালিকরা শ্রমিক ঠকাচ্ছে। এইরকম শিল্পবিরোধী পরিবেশ কোথাও নেই। অন্য রাজ্যের লোক বোকা তো নয়ই, তারা তো এরকম না করেই দিব্য ভালো আছে। দুই দশক ক্ষমতায় কাটিয়ে বুদ্ধদেববাবু চেষ্টা করেছিলেন। বামফ্রন্ট বুঝল যে শিল্পোন্নয়নই পশ্চিমবঙ্গের উন্নত ভবিষ্যতের পূর্বশর্ত। ভট্টাচার্য তাঁর সহকর্মী নিরুপম সেনের সঙ্গে জোরালোভাবে বিনিয়োগের আবেদন

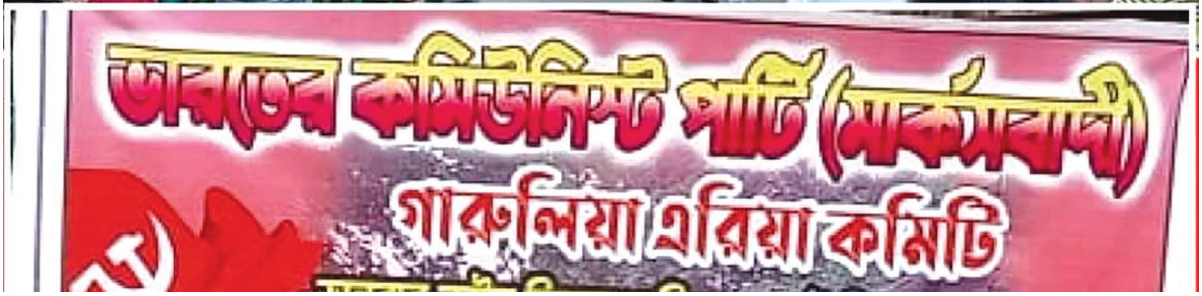

করেছিলেন এবং বিনিয়োগকারীরাও আগ্রহ নিয়ে এরাজ্যের দিকে তাকাতে শুরু করেছিলেন সিঙ্গুরে ন্যানো প্রকল্পের জন্য টাটা মোটরসকে আনার জন্য তারা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিল। কিন্তু ততদিনে বাঙ্গালি মানসে অরাজকতা ঢুকে গেছে। বিরোধিতার কারণে প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত গুজরাটের সানন্দে স্থানান্তরিত হয়।

কমিউনিস্ট মতবাদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো তাদের বিশ্বাস যে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর হয়রানির মধ্যেই দারিদ্র্যের সমাধান নিহিত। হয়তো সে কারণেই যে রাজ্য শিল্পে এক নম্বরে ছিল তা এখন 'শিল্প বন্ধ' রাজ্য হিসেবে পরিচিত। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উৎপাদন ভারতের শিল্প উৎপাদনের ৯.৮ শতাংশ ছিল যা সিপিএমের শাসনে ২০ বছরে মাত্র ৫.১ শতাংশ নেমে আসে। ১৯৮৬ সালে কলকাতা বিমানবন্দর ভারতের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণের প্রায় ১০ শতাংশ পরিচালনা করত যা ২০ বছরে ৪ শতাংশে নেমে আসে। বামফ্রন্ট কম্পিউটার নিষিদ্ধ করেছিল যখন সারা ভারতে তা চালু হয়েছিল, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগেও।

২। ১৯৭৫ সালে কংগ্রেস আমলের এইচবি মজুমদার কমিশনের দোহাই দিয়ে ১৯৮৩-তে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা নিষিদ্ধ হলো। কারণ দুটো ভাষা শেখা নাকি কঠিন, অবৈজ্ঞানিক। রাজ্যের ছাত্ররা জীবনের সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র চলে ক্যাডাররাজ ও দলবাজি।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পুরো ব্যয়বহনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। শিক্ষা বাজেটে চাপে পড়ে। শিক্ষার মানের অবনতি ঘটায়। স্কুলগুলোতে দলীয় ক্যাডার নিয়োগ করা হয় যারা বামপন্থী সমর্থনপুষ্ট হয়। স্কুলগুলি সরকারের কাছে থেকে সম্পূর্ণ অনুদান পেত তাই তারা এর ভাষা নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য ছিল এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সিপিএম ইউনিয়নে অংশগ্রহণে বাধা দিতে পারত না। প্রধান শিক্ষক থেকে সহকারি শিক্ষক সবেতেই পার্টিরাজ চালু হয়।

ইউনিয়ন অনুপ্রবেশ

১৯৮০ দশকের শেষে রাজ্যে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কেন্দ্রের প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করেনি। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যগুলি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও ছাত্ররা যেত। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি উদ্বিগ্ন সরকার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হয়ে রাজ্যে বেসরকারি প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুমতি দেয়। চিকিৎসা শিক্ষা বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয় অনেক পরে। ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে।

বামফ্রন্ট সিপিএম-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষক সংস্থাগুলোর সদস্যপদ বাড়ানোর সমস্ত সুযোগ নেয় --- এবিটিএ, এবিপিটিএ, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তাদের থেকেই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে সিপিএম নেতৃত্বাধীন সরকারের শিক্ষকদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। একইভাবে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। এই সংস্থাগুলোয় অ-বাম কোনো শিক্ষক থাকত না। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গকে এক-শহর-কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজ্যে পরিণত করে। লক্ষ্য কলকাতাকে বামঘাঁটি বানানো; সেখানে তারা সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত। এই অঞ্চলগুলোয় অপরিকল্পিত রিয়েল এস্টেটের উত্থান শুরু হলো পুকুর-জলাশয় যথেচ্ছ ভরাট হতে লাগল। বিল্ডিং তৈরি হলো— রাস্তা, নর্দমা ছাড়া। পুর বোর্ডগুলো বস্তি উন্নয়ন করেইনি। ৪৯০০টিরও বেশি বস্তি— বস্তিবাসীরা বড়ো ভোটব্যাংক। আরেক জনমোহিনী পদক্ষেপ— হকারদের ফুটপাতে অবাধ দখল যা শহরের রাস্তাকে আরও কমিয়ে দেয়। সঠিক পরিবহণ পরিকল্পনা না করে বাম সরকার কলকাতায় অটোরিক্সা চালু করে বিশৃঙ্খলা ও বায়ুদূষণ ঘটায়।

স্বাস্থ্যদপ্তর দেওয়া হয়েছিল আরএসপির ননী ভট্টাচার্যের হাতে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো ভূতের বাড়িতে পরিণত হয়েছিল। কার্যকর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। সারা দেশে ২০৮৩ রোগীপিছু একজন চিকিৎসক সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সেটা ৩৯৬৪। গ্রামীণ হাসপাতালে একজন চিকিৎসককে পাঠানো হতো তিনি অসুস্থ হলে ঘোর সমস্যা হতো। রুগি ভর্তি ট্রেন হাওড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণ ভারতে যেত। জেলা হাসপাতাল সিজারিয়ান ডেলিভারিও কলকাতায় রেফার করত। ১৯৭৭ থেকে গ্রামীণ এলাকায় কার্ডিয়োলজি, নেফ্রোলজি, সাইকিয়াট্রি এবং হেমাটোলজির কোনো পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। বাইপাস সার্জারি, ডায়ালিসিসের জন্য গ্রাম থেকে রোগীদের কলকাতায় বা রাজ্যের বাইরে যেতে হতো।

বাম সরকারের আরেক ব্যর্থতা হল চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামোয়। ৩৪ বছরে তিনটে মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়েছে, দুটো সরকারি। কর্ণাটকে ১০ বছরে ১৫টারও বেশি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, ছ'টি সরকারি। মহারাষ্ট্রে ১৫ বছরে ১৭টা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, পাঁচটি সরকারি।

৩। পুলিশে ইউনিয়ন— ১৯৭৯ সালে জ্যোতি বসুর মস্তিষ্ক-প্রসূত। পুলিশবাহিনীতে সবচেয়ে বেশি সুশৃঙ্খলা প্রয়োজন সেখানে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন গঠন ও দলীয় রাজনীতি ঢোকানো। জেলায় পুলিশ লাইনে নন-গেজেটেড ইউনিয়ন গঠনের পথও প্রশস্ত হয়। রাজনৈতিক সমীকরণ মেনে বেশিরভাগ পদোন্নতি ও পোস্টিং হতো, ইউনিফর্ম পরা কর্মীরা দলের সম্প্রসারিত শাখার সদস্য হলো। বাছাই করা আধিকারিকরা সরকার ও দলের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত থাকত। দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য আধিকারিকরা আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা সামলাতো। প্রশাসনের ব্যর্থতা দার্জিলিং বা নন্দীগ্রাম সর্বত্র।

কৃতজ্ঞ বাম সরকার ১০ লক্ষেরও বেশি সরকারি পদ বাড়িয়ে ক্যাডারদের খুশি রেখেছিল, প্রয়োজন থাক বা না থাক, যা সারা দেশে বৃহত্তম। সরকার ক্ষমতায় আসার তৃতীয় বছর থেকে নিয়োগ অভিযান শুরু হয়, আগস্ট ২০১০ পর্যন্ত তা চলে, খাদ্য ও

অসামরিক সরবরাহ, কৃষি, দমকল ও যুবসেবায় নিয়োগ করিয়ে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও শুধু দলীয় ক্যাডার ও তাদের আত্মীয়স্বজনরা চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র দুইতিন জনের বেশি সরকারি কর্মচারী আছে এমন অনেক পরিবার পাওয়া যায়। স্বজনপোষণের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কোষাগার ও মেধা দুই শেষ।

৪। প্রথমে ৩০ জন মন্ত্রীর স্লট তৈরি হয়েছিল সিপিএম ও জোটসঙ্গীদের সংকুলানে। দপ্তর বাড়ানো হতে থাকে। বেড়ে বেড়ে তা ৪৩-এ পৌঁছয়। শিক্ষাদপ্তর ভেঙে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা, গ্রন্থগার দপ্তর তৈরি হয়। দমকল বিভাগ সারা দেশে এই ধরনের একমাত্র বিভাগ। পিডব্লিউডি থেকে আবাসন সরানো হয়। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন, গণশিক্ষা, মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু জলসম্পদ, দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক ক্ষুদ্র বিভাগগুলিকে কেটে বের করা হয়েছিল।

এক সিনিয়র আইএএস অফিসার ঊর্ধ্বতন কর্তাকে জানিয়েছিলেন কাজের গতি বাড়ানোর জন্য। তাঁর প্রচেষ্টায় বার বার কর্মচারীরা প্রতিরোধ করছে। তিনি কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দের সহায়তা চাইলেও তারা নাচার ছিলেন। সরকার কখনই কর্মীদের বলেনি তাদের দায়িত্ব সময়ানুসারে পালন করতে হবে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন 'এখনই করুন' আদেশ করলেন এবং কর্মীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল কারণ ততদিনে রাজ্যের কর্মসংস্কৃতি ধ্বংস। পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে-বাইরে ধারণা তৈরি করেছে যে এ রাজ্যে কিছুই করা যায় না।

দলীয় নিয়ন্ত্রণ

এক কংগ্রেস নেতাকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের আমি বেগার শ্রমিক'— দল রাজ্যশাসনে নাক গলাত। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই সিপিএমের কমিউনিস্ট অনুশীলন শুরু হয়। জ্যোতি বসুর নিজের দলে দাপট ছিল, সরকারের কাজে পার্টির 'দৈনন্দিন মাথাগলানো' নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের আবদার মানেননি। কিন্তু প্রমোদবাবু চাপ দিয়ে কাজ হাসিল করেন এবং এটাই নীতি হয়ে ওঠে। সরকার রাইটার্স থেকে পরিচালিত হলেও রিমোট কন্ট্রোল ছিল আলিমুদ্দিনে--- ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ হোক বা আইএএস এবং আইপিএস অফিসার পোস্টিং।

৬। বৈজ্ঞানিক রিগিং একেবারে ১০০ শতাংশ সত্যি, ব্যক্তিগত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়।

৭। শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবিকার্জন ও ইতিহাস পরিচয়। কিন্তু সিপিএম আক্রমণকারীদের ইতিহাস শেখাতে বেশি আগ্রহী এবং দেশের গৌরবময় ইতিহাস নয়। মার্কস, মহম্মদ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিবেকানন্দের গুরুত্ব এক লাইনের। তারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের ঘৃণ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। হিন্দু ও হিন্দুত্বকে অভিশপ্ত করেছে। ইসলাম ও মার্কসবাদকে দেখানো হয়েছে শান্তিপূর্ণ মতাদর্শ। যেখানে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ঘৃণা ছড়ানো হয়, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের শেখানো হয় 'উচ্চ বর্ণের লোকেরা শূদ্রদের হত্যা করত এবং যে কোনও অজুহাতে পুরো গ্রাম নিশ্চিহ্ন করত'— ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ-২ পৃষ্ঠা ২৬। অত্যাচারী ইসলামি বহিরাগতদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে নেতিবাচকভাবে না দেখানো এবং মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য হানাদারদের সমস্ত গণহত্যার ইতিহাস মুছে ফেলে প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের প্রতিটি বিষয়ে বিষ ছড়ানো হয়।

৮। ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল সকালে, ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ১৬ জন সাধু এবং ১ জন সাধ্বীকে কলকাতার তিলজলায় আনন্দমার্গের সদর দপ্তরে এক শিক্ষা সম্মেলনে যাওয়ার পথে ট্যাক্সি থেকে টেনে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এবং তিনটি স্থানে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে যে হত্যাকাণ্ডটা দিনের আলোয় হাজার হাজার মানুষের সামনে সংঘটিত হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অমিতাভ লালার তত্ত্বাবধানে একটি একক সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন, 'অমিতাভ লালা তদন্ত কমিশন', বার বার আপিলের পর হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য মার্চ ২০১২ সালে গঠিত হয়েছিল। একটি আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়। গণহত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বসু ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন 'কী করা যেতে পারে? এই ধরনের ঘটনা ঘটে'। কমিশন সুত্রের মতে, নথিগুলি নির্দিষ্ট করে আঙুল তোলে যে কসবা-যাদবপুর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সিপিআইএম নেতারা ১৯৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পিকনিক গার্ডেনের কলোনি বাজারে আনন্দ মার্গীদের নিয়ে আলোচনা করতে মিলিত হন, তিলজলায় তাদের সদর দপ্তরে প্রবেশ করা কঠিন ছিল। বৈঠকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী, শচীন সেন, বিধানসভার প্রাক্তন সিপিআই(এম) সদস্য নির্মল হালদার, স্থানীয় সিপিআই(এম) নেতা তিলজলা-কসবা ১০৮নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর অমল মজুমদার এবং সেই সময়ে যাদবপুরের সাংসদ এবং পরবর্তীকালে

লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জি উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই হত্যার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়। আনন্দ মার্গীদের কমিউনিস্টরা ঘৃণা করত, কারণ তারা আদর্শগত ভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল। আসলে সিপিআইএম তাদের জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়েছিল, কারণ আনন্দমার্গীকে অনেক জনহিতকর কাজ করত ও বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। তাদের ছেলেধরা অজুহাতে লোক খেপিয়েছিল সিপিআইএম এবং পুরো পুলিশপ্রশাসনকে নির্বিকার, অক্ষম করে রেখেছিল। বালিগঞ্জ থানা বলেছিল বিজন সেতুর এপাশটা পর্যন্ত আমাদের, বিজনসেতু কসবা থানায় পড়ে। কসবা থানা বলেছিল ওটা রেলপুলিশের অন্তর্গত। রেল পুলিশ বলেছিল রেললাইনের উপর কিছু ঘটলে তা আমাদের কিন্তু এটা ঘটেছিল সেতুর উপরে যা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না!

৯। ১৯৪৭ সালে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কারণে দেশভাগের পরে কয়েক কোটি নিঃস্ব হিন্দু বাঙ্গালি পূর্বপাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গে। উদ্বাস্তুদের প্রথম ঢেউ বেশিরভাগ উচ্চবর্ণের। উচ্চ ও মধ্যবিত্তরা সহজেই পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসিত হয়েছিল। তবে বেশিরভাগ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পিছনে পড়ে থাকে। কিন্তু দরিদ্র, বেশিরভাগ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের এই পরবর্তী বিশাল ঢেউকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঊর্ধ্বগতি ১৯৭০-এর দশকে চরমে পৌঁছেছিল। ১৯৭৬-এ রাম নিবাস মির্ধা লোকসভায় বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে এবং অভিবাসীদের অন্যত্র স্থানান্তর অনিবার্য ছিল।

উদ্বাস্তুরা বর্জ্যভূমিতে স্থানান্তরের প্রতিরোধ করেছিল। প্রাথমিক প্রতিরোধের পর তাদের জোর করে দণ্ডকারণ্যের (বেশিরভাগ ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়) 'পাথুরে পাণ্ডববর্জিত রুক্ষ ভূমি' তরাই (উত্তরপ্রদেশ, এখন উত্তরাখণ্ডে) এবং লিটল আন্দামানে পাঠানো হয়। তাদের বেশিরভাগকেই ইতিমধ্যে ব্যর্থ দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের ধাক্কা বইতে হয়েছিল।

রাম চ্যাটার্জির মতো বামফ্রন্ট নেতারা তখন কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানান্তর নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। তারা দণ্ডকারণ্যে ক্যাম্প পরিদর্শন করে অভিবাসীদের কাছে পৌঁছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যদি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে তবে সমস্ত অভিবাসীদের ফিরিয়ে এনে পশ্চিবঙ্গেই বসতি স্থাপন করা হবে।

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর শরণার্থীরা বিপুল সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে শুরু করে। আনুমানিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার উদ্বাস্তুর প্রায় পুরোটাই দণ্ডকারণ্য থেকে আসা। কিন্তু বামফ্রন্ট শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গের নয়, ভারতের নাগরিক। আনুমানিক ১৫০০০০ উদ্বাস্তু যার প্রায় পুরোটাই দণ্ডকারণ্য থেকে এসেছিল, সেখানে তাদের বেশিরভাগকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০০০০ উদ্বাস্তু দক্ষিণে হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ ও গেঁওখালিতে চলে যায় এবং প্রায় ১৫০০০ জন সংরক্ষিত বন আইনের অধীনে একটা সংরক্ষিত স্থান ছোট্ট দ্বীপ মারিচঝাঁপিতে (তারা একে 'নেতাজী নগর' নাম দেয়) বসতি স্থাপন করে। একজন জীবিত ব্যক্তি দাবি করেছেন যে তারা যখন এসেছিল তখন দ্বীপে শুধুমাত্র ঝোপঝাড় ছিল। তারা মাছ ধরত এবং স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি করেছিল।

বাম সরকার ভেবেছিল যে সংরক্ষিত বনভূমির অননুমোদিত দখল এবং পরবর্তীকালে আরও উদ্বাস্তু আগমন সেই অঞ্চলে ঘটতে পারে, তা একটা গুরুতর পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। সরকার তাদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়া করেছিল, কিন্তু কার্যকর হয়নি। ২৪ জানুযারি ১৯৭৯-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মারিচঝাঁপি দ্বীপের চারপাশে সিআরপিসি ১৪৪ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জারি করে। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু করে। ত্রিশটি পুলিশ লঞ্চ দ্বীপে টহল শুরু করে, দ্বীপের বাসিন্দাদের খাবার ও জল সরবরাহ করতে বাধা দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বলছে যে ৩১ জানুয়ারি পুলিশ দ্বীপের বসতি স্থাপনকারীদের উপর গুলি চালায়। যখন বসতি স্থাপনকারীরা দেশী অস্ত্র নিয়ে একটা পুলিশ ক্যাম্পে আক্রমণ করে, ১৩ জন নিহত হয়। মৃত্যুর সংখ্যা কখনই নিশ্চিত করা যায়নি তবে বিভিন্ন বিবরণ অনুসারে এটা ৫০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে। সরকারি মৃত্যুসংখ্যা ছিল দুই। বেসরকারি মতে মৃত পাঁচ হাজার। ১৫ দিন পর কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেয় যে 'মারিচঝাঁপিতে পানীয় জল, প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী এবং ওষুধের পাশাপাশি ডাক্তারদের যাতায়াতের অনুমতি দিতে হবে।'

অবশিষ্ট ২৫০-৩০০ উদ্বাস্তুর মধ্যে কিছুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানো হয় এবং বাকিদের পুলিশ লঞ্চে করে হাসনাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বারাসতের কাছে কলোনিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যরা শিয়ালদহের রেলপথের কাছে ঝুপড়িতে নিজেদের পুনর্বাসন করেছিলেন। জীবিতদের মধ্যে কিছু হিঙ্গলগঞ্জ, ক্যানিং এবং আশেপাশের এলাকায় নিজেদের পুনর্বাসন করে।

এই ঘটনাটি ১৯৮৩ সালের নেলি গণহত্যা, ১৯৮৪ সালের শিখ গণহত্যা এবং ১৯৯০-এর কাশ্মীরি পণ্ডিত হত্যা হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনত্তোর ভারতে সংঘটিত সবচেয়ে সহিংস এবং নৃশংস মানবাধিকার লঙ্ঘন।

১০। সিপিআইএম গুন্ডারা স্বয়ংসেবকদের লোকদের হত্যা করেছে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে। সবচেয়ে লজ্জার ঘটনা ছিল সাঁইবাড়ি। সিপিআইএম গুন্ডারা দুই ভাই প্রণব ও মলয় সাঁইকে খুন করে তাদের মাকে রক্তমাখা ভাত খেতে বাধ্য করে।

বামপন্থীরা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বাইরে একটা ধাঁধা তৈরি করেছে; সিপিএম কীভাবে ৩৪ বছর ধরে শাসন করতে পারে, যেখানে তারা সামুহিক পতনের নেতৃত্ব দেয়, শিল্প রাজ্য থেকে পালিয়ে যায়, খামারের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্য বেড়ে যায়? স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ধ্বংস হয়ে গেছে, দুর্নীতি বেড়েছে এবং রাজনৈতিক সহিংসতা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালি ভোটার কি অন্ধ ছিল, নাকি অন্য কিছু তাদের ভোট দিতে বাধ্য করেছে? বুদ্ধ-বিমানরা কি দায় এড়াতে পারেন? □

যারা কর্মীদের রক্তের মূল্য দেয় না তারা সুবিধাবাদী

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল রাজ্যের সমস্ত বিরোধী দলের প্রার্থী ও সমর্থকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। এই নির্বাচনে এ পর্যন্ত ৫২ জন মানুষের প্রাণ গিয়েছে। নির্বাচনের আগে বোমা বারুদ মজুত করার ফলে বিস্ফোরণে কম-বেশি ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুধের শিশুও বাদ যায়নি। আর সরকারি মদতে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর হাতে বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের মোট ৫২টি তাজা প্রাণ ঝরে গেছে। এই বঙ্গে কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর নেতারা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আমৃত্যু তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা করেছে। চিৎকার করে বলছে, শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। ত্রিপুরা, মণিপুর ও মেঘালয়ে তৃণমূল দলটি কংগ্রেসকে ভেঙে নিজের দল গড়েছে। কংগ্রেস নেতারা তাদের সদস্যদের রক্তের হোলি খেলায় মত্ত তৃণমূলকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখছে। হাসি মুখে ফোটোসেশন করছেন। এরা সত্যি দু-কান কাটা। দিল্লির আম আদমি পার্টির লোকজন চায় না তাদের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল রাহুলের সঙ্গে হাত মেলাক। দেখুন, কী মূল্য আছে তাদের কর্মীদের ইচ্ছার? না কংগ্রেস, না সিপিআইএম আর না আম আদমি পার্টির নেতাদের কাছে। তাদের কর্মীদের ইচ্ছার প্রতি কোনো নূন্যতম সম্মান দেখানোর প্রয়োজনীয়তা নেই।

২৬ দলের মধ্যে আছে মাত্র ২টি জাতীয় দল। এই ২৬ দলের মধ্যে আজ অধিকাংশ জামিনে থাকা পারিবারিক দলের নেতারা। আছে দণ্ডপ্রাপ্ত ও আদালতে দুর্নীতির দায়ে চার্জশিট পাওয়া নেতারা। তারা প্রত্যেকেই জানে নরেন্দ্র মোদী যদি ২০২৪ সালে আবার দেশবাসীর আশীর্বাদ পান তাহলে তাদের আর কিছুতেই নিস্তার নেই। তাদের জেলযাত্রা পাকা। তাই আর তাদের দেশের মানুষের ভালো-মন্দের দিকে কোনো নজর নেই, আছে শুধু নিজেদের পিঠ বাঁচানোর তাগিদ। দেশের মানুষ কি বোকা নাকি? ওরা মানুষকে বোকা বানানোর জন্য পাটিগণিতের কথা বলছে। ওদের বক্তব্য হলো, বিজেপি ২০১৯ সালে ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বাকি ৫৫ শতাংশ ভোট ওদের। তাই তো অখিলেশ যাদব বেঙ্গালুরুতে পা দিয়েই বলেন ২/৩ ভাগ জনগণ ওদের সঙ্গে আছে। আর যখন অখিলেশ যাদব বেঙ্গালুরুতে বড়ো বড়ো কথা বলছেন তখন উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের দুই বড়ো নেতা অখিলেশের সঙ্গ ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে।

ওদিকে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এনডিএ-তে আছে ৩৮টা রাজনৈতিক দল। ওদের পাটিগণিতের যুক্তি খাটবে না। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ১৩১ জন সাংসদ ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বজুড়ে খ্যাতির স্রোত বয়ে চলেছে। তাতে ওদের ২৬ দলের নেতাদের হিংসা হলেও দেশের জনগণের আশীর্বাদ আছে। তারা গর্বিত ভারতবাসী। নির্বাচনে এর প্রভাব কি কম?

লোকসভা নির্বাচনের ৯ মাস বাকি। ওরা এই ৯ মাসে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির নামে কুৎসা রটাবে। আর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি এই ৯ মাসে করবে কাজ। এই ৯ মাসে কুৎসা ও কাজের লড়াই হবে। আসতে পারে দেশবাসীর কাঙ্ক্ষিত বিল, উন্মোচন হবে ভারতবাসীর গর্বের রামমন্দির। সমাপ্ত হবে শতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান হানাহানি। রাহুল গান্ধীর প্রয়াত পিতা রাজীব গান্ধী রামমন্দির থেকেই তার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন। এছাড়া আছে জি-২০ সামিট। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত তার কাণ্ডারি। হবে দেশের সব সংসদীয় ক্ষেত্রে তার সভা। ওরা করুক কুৎসা। এর সঙ্গে বিরোধী দলের অনেক নেতা-নেত্রীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের জাল গুটিয়ে আনবে ইডি ও সিবিআই। সত্য মানুষের সামনে আসবে। দেশবাসী কাজ দেখে রায় দেবে। মানুষ কখনো অসৎ সুবিধাবাদী জোটকে সমর্থন করবে না।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

ফরাসি বিপ্লব, বাস্তিল দুর্গের পতন সত্যি কি স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী দান করতে পেরেছে?

বাস্তিল দুর্গের পতন এক মানবিকতার জয়। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর জন্ম হয় ফ্রান্স নামক এই দেশেই যাকে আমরা প্রেম, ভালোবাসা, কবিতার দেশ বলে জানি। ছবির দেশ বলে সকলে চেনে। এই দেশেই জন্ম হয় বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী মাটিস-মানেট পিজারোর। বাস্তিল দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেয় রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের অভিষেক হয়। বাস্তিল দুর্গ ছিল নিষ্ঠুর, অত্যাচারের প্রতীক। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বিদায় নিতে হয় রাজতন্ত্রকে। জনগণের মুক্তি উপায় হলো রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, বাস্তিল দুর্গ কী? ফরাসি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতীক। বিনা বিচারে নিরীহ জনগণকে এখানে বন্দি করে রাখা হতো। ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের নিষ্ঠুর আচরণ জনসাধারণ মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাধারণ জনতা ক্ষেপে গিয়ে সরকারের অস্ত্র ভাণ্ডার লুঠ করে। সশস্ত্র জনতা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জুলাই কুখ্যাত বাস্তিল আক্রমণ করে বন্দিদের মুক্ত করে। বাস্তিল দুর্গের পতন স্বাধীনতার উন্মেষ কাল বলে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকরা। সারা বিশ্বে এর প্রভাব বহুমুখী এবং সুদূর

প্রসারী। এই দুর্গের পতনের ফলে রাজতন্ত্রের এবং সামন্ততন্ত্রের দুয়ের অবসান ঘটে। মাথাপিছু ভোটের দাবি চালু হয়।

আমাদের গণতন্ত্র দিবসের মতো ফ্রান্সে বাস্তিলের পতনকে কেন্দ্র করে বাস্তিল দিবস পালিত হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ঘোষণা করা হয় জাতীয় ছুটি। ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ২৩৩ বছর আগে বাস্তিলের পতনের হয়। সেই বাস্তিল দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছিলেন সে দেশের বিশেষ অতিথি। তাঁকে ফ্রন্সের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান লিজিয়ন অফ অনারে ভূষিত করেন। তিনিই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি এই সম্মানে ভূষিত হলেন।

ভাবতে অবাক লাগে, এই কবিতার দেশে বর্ণবৈষম্যের আগুনে ছারখার হচ্ছে তাদের জীবন। ১৭ বছরের নেহাল নামক এক যুবকের মৃত্যু সে দেশকে এখন জাতীয় সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। জাতি দাঙ্গার লেলিহান শিখায় দেশ এখন জ্বলছে। শত শতাব্দী প্রাচীন মার্সেইয়ের জগৎ বিখ্যাত আলকাজার লাইব্রেরিকে আগুনে পোড়ানো হয়। বাদ যায়নি সে দেশের মেয়রের বাড়িও। অদ্ভুত এক অস্থিরতা, নৈরাজ্য বিরাজ করছে। সে দেশের প্রতিটি নাগরিক এখন প্রাণ নাশের আশঙ্কায় ভয়ে কম্পিত হয়ে আছে।

ফ্রান্স-সহ ইউরোপের উন্নত দেশগুলো এখন ভারতের হাত ধরে বাঁচতে চাইছে। ভারত এখন তাদের পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করছে। ভাবতে ভালো লাগে যারা এক সময় আমাদের দাস করে রেখেছিল, এখন তারা দাসের মতো ভূমিকা পালন করছে। সারা বিশ্বে ভারত এখন শান্তির দূতের ভূমিকা পালন করছে। আজ পূর্বে দেখেছি সূর্যের দীপ্তমালা এবং পশ্চিমের সূর্য ডোবার পালা শুরু হয়েছে। সেদিন কেন সাম্রাজ্যবাদী কবি রুডইয়াড কিপলিং বলেছিলেন, 'East is east and West is West'. আজ বুঝতে পারছি সত্যি পূর্ব পশ্চিমের সঙ্গে কখনো মেলে না। আলো অন্ধকার কখনো এক সঙ্গে মিলিতে পারে না। আজ তারা অমাবস্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত আর আমরা পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে তাদের আলো দান করছি। এটা ভালো লাগারই কথা। আজ তারা যেমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তেমন জাতি দাঙ্গায় জর্জরিত। বাস্তিল দুর্গের পতনের সঙ্গে যদি হিংসা, বিদ্বেষ নাশ হতো, আজকে হয়তো এই জ্ঞানের মন্দির আলকাজার লাইব্রেরি জাতি দাঙ্গার শিকার হতো না, ফ্রান্স আগুনে জ্বলতো না। ফ্রান্সে সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ খুন করার যন্ত্র গিলোটিন। এক অন্ধ ধর্মের জিগির থেকে সারা বিশ্বকে বাঁচতে সেই নিষ্ঠুর গিলোটিনের কথা স্মরণ করাচ্ছে। সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্যে চাই গিলোটিন, সে যতই নিষ্ঠুর হোক।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

নববঙ্গের আবির্ভাব হোক

আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী নাগরিক তারা দেশের বাইরে গেলে নিজেদেরকে ভারতীয় বলি। রাজ্যের বাইরে কোনো সমাবেশে সেল্ফ ইন্ট্রোডাকশনে বলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি। কারণ সকলেই সেখানে ভারতীয়। এমনকী এই বঙ্গে বসবাসকারী কোনো বিহারবাসী বা তামিল বলে সে পশ্চিমবঙ্গের তামিল বা পশ্চিমবঙ্গের বিহারি। কিন্তু বাঙ্গালি বললেই অনেকে বাংলাদেশির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। কারণ পূর্ববঙ্গ বলে কিছু নেই। দেশভাগের পর পর আমরা যাকে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববাংলা বলতাম তার প্রকৃত পরিচয় ছিল পূর্বপাকিস্তান।

স্বাধীনতার পর ভারতে অনেক রাজ্যই বিভক্ত হয়েছে কিন্তু তাদের সাবেক নামের সঙ্গে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ শব্দ যুক্ত হয়নি। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ভেঙে যথাক্রমে তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাঞ্চল হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে শুধু বঙ্গ না করে কেবল 'বাংলা' করতে চাইছেন এখানকার মুখ্যমন্ত্রী। এবং স্বভাবতই নিজের রাজ্যের জয়ধ্বনি দিতে তিনি ও তাঁর দল 'জয়বঙ্গ' না বলে 'জয়বাংলা' বলছেন। কিন্তু নেতাজীর কণ্ঠে 'জয় হিন্দ' মানেই যেমন অখণ্ড ভারতের ছবি ভেসে উঠত, তেমনি 'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে এই পৃথিবীতে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভেসে ওঠে। ১৯৭১-এ কলকাতার ব্রিগেডে ইন্দিরা গান্ধীকে পাশে নিয়ে মুজিবুর রহমানকে 'জয় বাংলা' ও 'জয় ভারত' বলতে শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য অন্য কিছু ক্ষেত্রে বঙ্গ বিরোধী নন, যেমন রাজ্যের লোগোতে ব, বিশ্ব বঙ্গ সরণি, বিশ্ব ভারতীর পালটা বোলপুরে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের মজ্জায় মেধায় অসংস্কৃতজ এই বাংলা শব্দ সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা মিশে আছে। সেটা আমরা মানি বা না মানি। স্বাধীনতার আগে যেসকল স্কুলে ইংরেজি ছিল না তাদের বাংলা স্কুল বলা হতো। নীচু ডালার যে লরিগুলোতে ইট বালি আনা হয় সেগুলোকে বাংলা ডালা বলা হয়। এমনকী খালাসিটোলায় পরিবেশিত পানীয়টির সঙ্গেও বাংলার যোগ আছে।

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু গোঁয়ার্তুমি আছে। আজকের পশ্চিমবঙ্গের জন্মের মধ্যে যে পূর্ববঙ্গের ইতিহাস বর্তমান সেটা জানানোর জন্যই তারা নাম বদলের বিরোধী। শুধু 'বঙ্গ' হলে উত্তরবঙ্গ কিউ-এর সঙ্গে ইউ-এর মতো লেগে যেতে পারে। আর ফারাক্কার উত্তরের বঙ্গ আলাদা হলে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হবে আমার ছোট্ট মাথায় আসে না। গোর্খা, লেপচা, কামতা, কোচ, রাজবংশী, গৌড়ীয়দের আদ্যক্ষর নিয়ে ইকবালের গড়া পাকিস্তানের মতো কাকোগোলেগৌরা বা বরেন্দ্রভূমি নাম দিলে কেমন হয়? এলিট বাঙ্গালি ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গ ভাগ না চাইলেও গঙ্গা-পদ্মার জল ঘোলা করে ১৯৪৭-এ পান করেছে। এবার বোধ হয় মহানন্দার জল পান করে নতুন রাজ্যের অভিষেক হতে চলেছে।

—অভিজিৎ সরকার,
রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর।

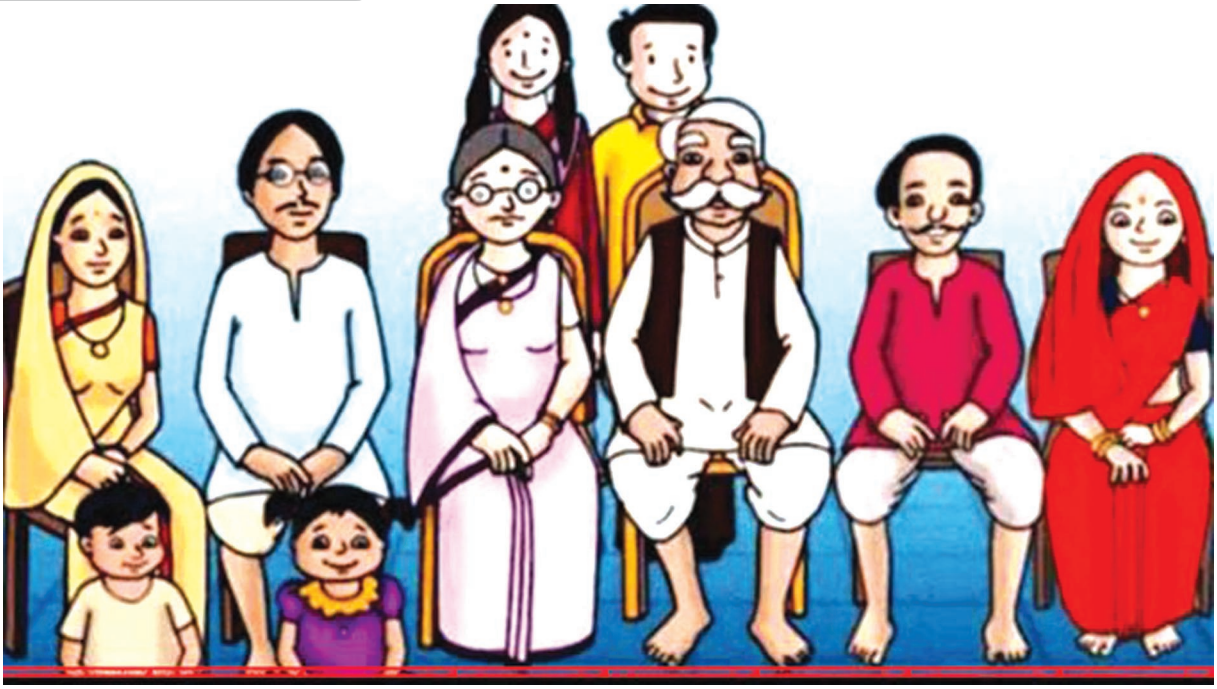

যৌথপরিবারকে টিকিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন

মালবিকা দাস প্রামাণিক

পারিবারিক জীবনের সমৃদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে প্রধানত যৌথ পরিবার বা একান্নবর্তী পরিবারকে কেন্দ্র করে। বিশেষত বাঙ্গালির কাছে যৌথ পরিবার ছিল অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ব্যক্তির মন-প্রাণের বিকাশের শক্তি নিহিত থাকে তার পরিবারের মধ্যে। পরিবারের মধ্যে থেকেই ঘটতে পারে কোনো ব্যক্তির সুস্থ বিকাশ আর একেকটি ব্যক্তি ও তার পরিবারকে নিয়েই গড়ে ওঠে একটি সুস্থ সমাজ।

যৌথ পরিবারে মূলত বিভিন্ন সম্পর্কের অস্তিত্ব বজায় থাকে। পারস্পরিক বিভিন্ন সম্পর্কের সহাবস্থানই একটি আদর্শ পরিবারের লক্ষণ আর এই আদর্শ পরিবারই আদর্শ ব্যক্তি তৈরির চাবিকাঠি।

কিন্তু বর্তমান যুগ-পরিবেশে দেখা যাচ্ছে যৌথ পরিবারগুলি অবলুপ্তির পথে চলে গেছে। এর কারণ নিহিত মূলত কোথায়? পারস্পরিক হিংসা, লোভ ও স্বার্থপরতাই যৌথ পরিবার ভাঙনের মূল কারণ।

শুধু এ যুগ কেন, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিতেও আমরা যৌথ পরিবার ধ্বংসের চিত্র দেখতে পাই। তার মূলেও আছে লোভ ও স্বার্থপরতা। রামায়ণের চিত্রে দেখা যায় কৈকেয়ীর স্বামীর কাছে বর প্রার্থনা, তাতে নিজপুত্রের জন্য ক্ষমতালাভের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে রামের পিতৃসত্য পালনে তাঁর ত্যাগের মাধ্যমে সিংহাসন লাভে অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে একদিকে লোভ বা স্বার্থপরতা মাথাচাড়া দিলেও অন্য পক্ষের স্বার্থত্যাগ পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে কোনো সংঘাতের সৃষ্টি হয়নি, পারিবারিক বন্ধন অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আবার মহাভারতে দেখা যায় কৌরবপক্ষের দুর্দমনীয় লোভ, বিদ্বেষ পাণ্ডবপক্ষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল, ফলস্বরূপ যুদ্ধের মাধ্যমে ঘটেছিল পারিবারিক ধ্বংসসাধন। দুটি চিত্রে দুরকম দেখা যায়। একদিকে কৈকেয়ীর লোভ রামের ত্যাগ ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে লোভ ও হিংসা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ ধর্মসংকটের সৃষ্টি। তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অন্যায়কারীর শাস্তিবিধান করেছেন।

বর্তমানে ভারতীয় পরিবার ও সমাজ জীবনে যা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে তা হলো হিংসা, লোভ ও স্বার্থপরতা। পরিবারের কোনো সদস্যের ত্যাগের দ্বারা আর এ সবকে বশীভূত করা যাচ্ছে না কেউ ত্যাগ করলে অন্যরা তার সুযোগ নিয়ে আরও বেশি পরিমাণে লাভের অংশ খুঁজতে থাকে তার ফলে পরিবার ভাঙনের মুখে পড়ে।

একে অপরের পাশে থাকা পরিবারের সকলের শুধুমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যই নয়। সেখানে আত্মিকতার যোগ থাকা প্রয়োজন বর্তমানে ব্যক্তির মধ্যে এই আত্মিক যোগের একান্ত অভাব। যেখানে আন্তরিকতার অভাব সেখানে বাহ্যিকতা যেন আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে।

যেখানে আত্মিক সম্পর্কগুলি ছিন্ন হয়ে পরিবার পরিজন হয়ে যায় পর, সেখানে বাহ্যিক একাত্মতা ভালো কিছুকে আনতে পারে না, বরং ধর্মসংকটেরই সৃষ্টি করে। তাই বিদ্বেষ, লোভ ও স্বার্থপরতাকে দমন করে যদি আত্মিক সম্পর্ক গুলোকে রক্ষা করা যায় তবেই সুন্দর হয়ে ওঠে পারিবারিক বন্ধনগুলি আর টিকে থাকে যৌথপরিবার। যৌথপরিবারকে টিকিয়ে রাখা অনেকটাই নির্ভর করে পরিবারের মহিলা সদস্যদের ওপর। ◻

বর্তমানে পুরুষ বন্ধ্যাত্ব একটি জ্বলন্ত সমস্যা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, একটানা ১২ মাস স্বাভাবিক মেলামেশার পরেও কোনও দম্পতি সন্তানধারণে অসমর্থ হলে বুঝতে হবে ওই দম্পতি ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। নানা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বন্ধ্যাত্বের সমস্যার পিছনে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা থাকে পুরুষের। ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে মহিলার এবং ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে উভয়ের সমস্যা থাকতে পারে। মুশকিল হলো, আমাদের সমাজে কোনও দম্পতির সন্তান না হলে বারবার অভিযোগের তর্জনী ঘুরে যায় মহিলার দিকে। অথচ আধুনিক সময়ে পুরুষ বন্ধ্যাত্ব জ্বলন্ত সমস্যা। তাই চোখ উলটে না থেকে বাস্তবটা স্বীকার করাই পরিণত মানসিকতার লক্ষণ। দেখা যাক কোন সমস্যাগুলি পুরুষ বন্ধ্যাত্বকে চিহ্নিত করে—

- একবার এজাকুলেশনে সিমেনে স্পার্মের স্বাভাবিক সংখ্যা প্রতি মিলি লিটারে প্রায় ১.৫ কোটি থেকে ২ কোটি। অতএব স্বাভাবিকের চাইতে স্পার্মের সংখ্যা কম থাকলে হতে পারে পুরুষ বন্ধ্যাত্ব।
- স্পার্মের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে বা সক্রিয় না থাকলে হতে পারে বন্ধ্যাত্ব।
- কোনও প্রতিবন্ধকতার কারণে স্পার্ম সঠিকভাবে বেরতে না পারলেও পুরুষ বন্ধ্যাত্ব প্রকট হতে পারে।

এই সমস্যাগুলি তৈরি হওয়ার পিছনে দায়ী থাকতে পারে দুর্ঘটনাজনিত আঘাত, দীর্ঘকালীন শারীরিক সমস্যা, অলস ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং অন্যান্য কিছু কারণ। পুরুষদের বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে স্পার্মের স্বাস্থ্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্পার্মের স্বাস্থ্য বলতে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং সক্রিয়তা বজায় রাখার কথাই বলা হচ্ছে। কারণ সংখ্যা কম থাকলে যেমন বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে, তেমনই স্পার্ম যদি গতিহীন ও দুর্বল হয় তাহলেও তা নিজে এগিয়ে গিয়ে ওভামকে নিষিক্ত করতে পারবে না।

মেল ইনফার্টিলিটির কারণ :

- রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গণ্ডগোল (৫ শতাংশ)
- হাইপোগোনাডিজম (১০ শতাংশ)
- ভেরিকোসিল (১৭ শতাংশ)
- সিস্টেমিক ডিজিজ (৩ শতাংশ)
- ইউরোজেনাইটাল সংক্রমণ (৯ শতাংশ)
- আনডিসেন্ডেড টেস্টিকলস (৮ শতাংশ, এক্ষেত্রে টেস্টিকল স্বাভাবিক অবস্থানে নেমে আসে না)
- অন্যান্য কারণ (৮ শতাংশ)
- ব্যাখ্যাতীত (৩৪ শতাংশ)

কোন কোন কারণে স্পার্ম কাউন্ট কমে :

অসংযমী জীবনযাত্রা : অলস ও শরীরচর্চাহীন জীবনযাপন বন্ধ্যাত্বের বিশেষ কারণ। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অন্যতম অঙ্গ হলো ব্যায়াম। ফিট থাকতে সপ্তাহে পাঁচদিন ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করতেই হবে। ব্যায়ামের অভ্যেস বাড়ায় সামর্থ্য, রোগপ্রতিরোধ শক্তি, দ্রুত সুস্থ হওয়ার ক্ষমতা করে তোলে সন্তানধারণের উপযোগী।

ধূমপান ও মদ্যপান : রোজ অ্যাককোহল পানের অভ্যেস পুরুষের দেহে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। হ্রাস করতে পারে স্পার্মের উৎপাদন। ধূমপান থেকেও স্পার্মের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই যত দ্রুত সম্ভব ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যেস ত্যাগ করতে হবে।

স্ট্রেস : ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রের একটানা উদ্বেগও প্রভাব ফেলতে পারে প্রজনন ক্ষমতায়। কারণ, ক্রনিক স্ট্রেস বেশ কিছু হরমোনের উৎপাদনে বাধা তৈরি করে যা স্পার্ম তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করে। অতএব স্ট্রেস সামলাতে নিয়মিত ধ্যান ও যোগাসন করুন। এছাড়া পড়তে পারেন বই, নাচতে ও গাইতে পারেন ইচ্ছেমতো। তুলতে পারেন ছবি, করতে পারেন বাগান।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস : অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাদ্য, প্রসেসড ফুডে স্পার্ম কাউন্ট কমতে পারে। তাই সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন। শাকসবজি বেশি করে খান। পাতে রাখুন মরশুমি ফল।

স্থূলত্ব : সন্তানধারণে বাধা তৈরি করতে পারে অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলত্বের সমস্যা। কমাতে পারে স্পার্ম কাউন্ট। দৈহিক উচ্চতায় তুলনায় ওজন কম থাকলেও হতে পারে সমস্যা। তাই স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন ডায়েট ও এক্সারসাইজের মাধ্যমে।

অসুরক্ষিত সংসর্গ : একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে অসুরক্ষিত ঘনিষ্ঠ মেলামেশা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ-এ (এসটিডি) আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। মেল ইনফার্টিলিটির পিছনে এসটিডি একটি বড়ো কারণ।

ড্রাগ : পেশির জোর বাড়তে অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে অ্যানাবলিক স্টেরয়েডের ব্যবহার থেকেও আসতে পারে বন্ধ্যাত্ব। কারণ এই ধরনের স্টেরয়েডের নিয়মিত ব্যবহারে টেস্টিকল সংকুচিত হয়ে যায়। সাময়িকভাবে হ্রাস পেতে পারে স্পার্ম উৎপাদন। □

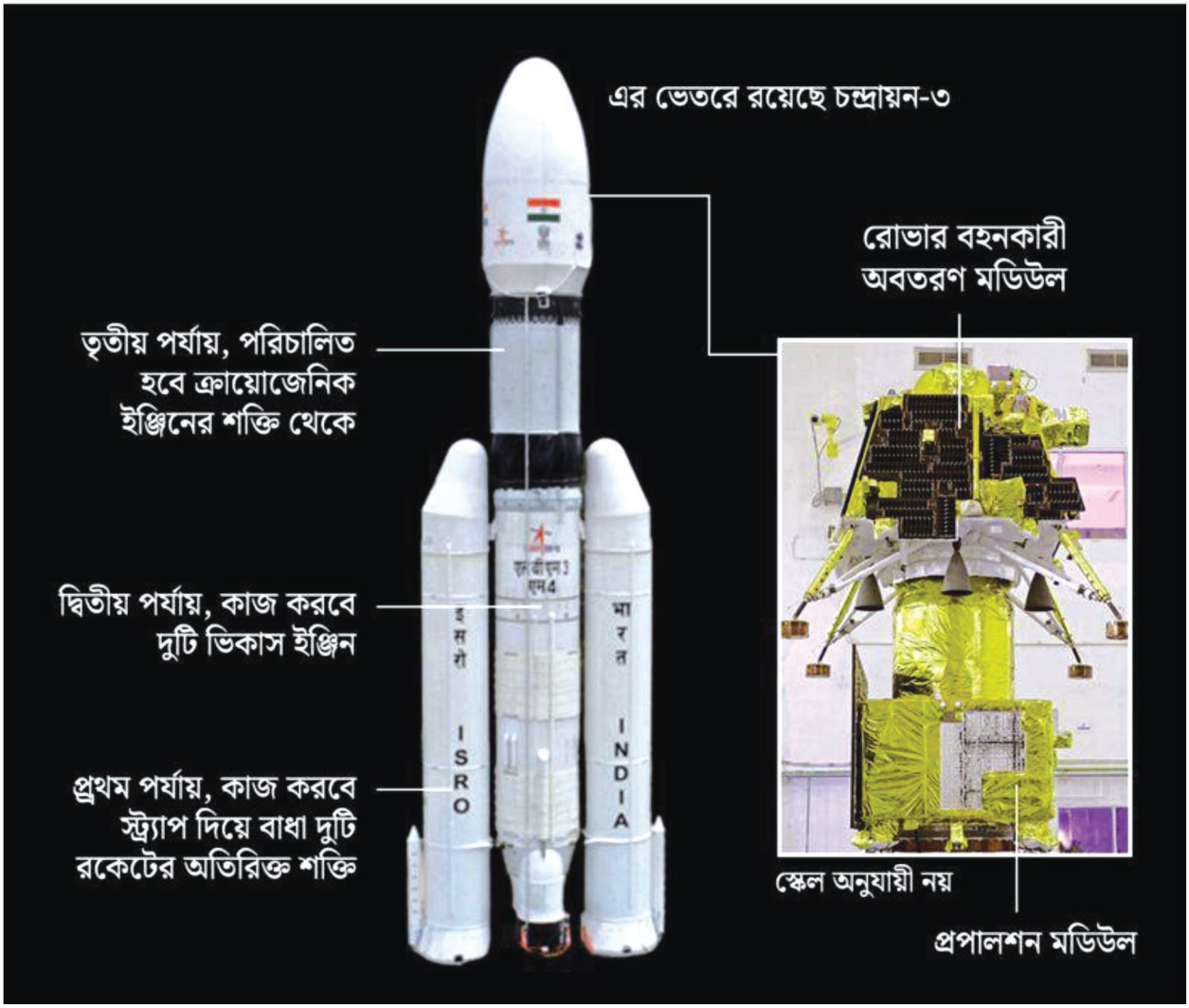

চন্দ্রযান ১-২-৩ : মহাকাশ গবেষণায় ভারতের এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সাফল্য

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র উদ্যোগে ভারতের প্রথম চন্দ্র অভিযান 'চন্দ্রযান-১'। সেই মিশনটি মনুষ্যচালিত বা ম্যানড মিশন ছিল না। চন্দ্রযান-১ ছিল একটি অরবিটর ও একটি ইমপ্যাক্টর সংবলিত। পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকলের একটি উন্নত সংস্করণ- পিএসএলভি-সি১১ দ্বারা এই মহাকাশযানকে ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর ভারতীয় সময় সকাল ৬টা২২ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই অভিযানের ব্যাপ্তিকাল ছিল ২ বছর। উৎক্ষেপণ মুহূর্তে এই মহাকাশযানের ভর ছিল ১৩৮০ কিলোগ্রাম। চান্দ্র কক্ষপথে প্রবেশকালে এর ভর দাঁড়ায় ৬৭৫ কিলোগ্রাম, অবতরণের সময়ে মূল ইমপ্যাক্টরটির ভর ছিল ৫২৩ কিলোগ্রাম। উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ২৩ দিন পর, ১৪ নভেম্বর 'মুন ইমপ্যাক্ট প্রোব'-টি চন্দ্রযান থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুর একটি ক্রেটার বা গহ্বর শ্যাকলটনে সফলভাবে অবতরণ করে। চাঁদের মাটিতে এই অবতরণের মাধ্যমে রচিত হয় এক ইতিহাস। আমেরিকার নাসা, রাশিয়ার রসকসমস, চীনের সিএনএসএ-র পর মহাকাশ কর্মসূচিতে এহেন সাফল্যের ক্ষেত্রে চতুর্থ সংস্থা রূপে আত্মপ্রকাশ করে ভারতের ইসরো।

এই ইমপ্যাক্টরটিতে দৃশ্যমান (ভিসিবল্), ইনফ্রারেড, সফট্ ও হার্ড এক্স রশ্মির ভাইব্রেশন বা স্পন্দন পরিমাপের জন্য উচ্চ

উৎক্ষেপণস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চন্দ্রযান-৩

রেজোলিউশনের রিমোট সেন্সিং যন্ত্রপাতি (পেলোড) নিয়ে যাওয়া হয়। চাঁদের মাটিতে জলের উপস্থিতি পরীক্ষা করা ছাড়াও চন্দ্রপৃষ্ঠের রাসায়নিক চরিত্র সংবলিত একটি সম্পূর্ণ মানচিত্র এবং একটি ত্রিমাত্রিক টোপোগ্রাফি অঙ্কন ছিল ২ বছরের সময়কালে এই রিমোট সেন্সিং ইমপ্যাক্টরটির লক্ষ্য। অবতরণের ক্ষেত্রে চাঁদের মেরু অঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ এখানেই আছে বরফ পাওয়ার সম্ভাবনা। চন্দ্রযান-১-এর মোট প্রকল্প ব্যয় ছিল ৩৮৬ কোটি টাকা। এই মিশনে ইসরোর ৫টি পেলোড এবং নাসা, ইওরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ইএসএ), বুলগেরিয়ান স্পেস এজেন্সি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার ৬টি পেলোড বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইসরো দ্বারা পরিচালিত ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্র অনুসন্ধান অভিযান ও আনম্যানড মিশন হলো 'চন্দ্রযান-২'। চন্দ্রযান ২-এ ৩টি অংশ ছিল অন্তর্ভুক্ত- চাঁদের কক্ষপথে পরিক্রমণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ বা অরবিটার, চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণকারী ল্যান্ডার ও রোভার। এই অভিযানের মূল বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য ছিল অরবিটার ও ল্যান্ডার-রোভারের সাহায্যে চান্দ্র ভূসংস্থান, মৌল ও খনিজের সন্ধান, চন্দ্র এক্সোস্ফিয়ার, চন্দ্রপৃষ্ঠে হাইড্রক্সিল সিগনেচার বা চন্দ্রজলের স্বাক্ষরগুলির অধ্যয়ন, চন্দ্র-রেগোলিথের বেধ নির্ণয়ের সময়ে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের চন্দ্র-জলের অবস্থান ও পরিমাণের ভিত্তিতে চন্দ্রপৃষ্ঠের ত্রিমাত্রিক বা ৩ডি মানচিত্র তৈরি করা। ১২ নভেম্বর, ২০০৭-এ ইসরো ও রসকসমস চন্দ্রযান-২ প্রকল্পে একযোগে কাজ করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০০৮ সালে ভারত সরকার এই অভিযানকে অনুমোদন দেয়। ২০১৩ সালে এই অভিযানটি স্থগিত করা হয় এবং ২০১৬ সালে এই অভিযান শুরু করার নতুন সময়সীমা নির্ধারিত হয়। মঙ্গল গ্রহে ফোবোস-গ্রান্ট মিশনের সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তিগত দিকগুলি চন্দ্রযান-২ প্রকল্পে ব্যবহার করতে চেয়েছিল রসকসমস। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই মিশন ব্যর্থ হওয়ার দরুন চন্দ্রযান-২ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ল্যান্ডার সরবরাহ করার অক্ষমতার উল্লেখ রাশিয়া করলে ২০১৫ সালে ভারত এককভাবে

ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে নয়া অধ্যায় তৈরি করল চন্দ্রযান-৩। যা প্রত্যেক ভারতীয় স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষাকে নয়া উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা যে কতটা উদ্যমের সঙ্গে কাজ করেন, তার প্রমাণ হলো চন্দ্রযান-৩। তাঁদের মনোবল ও উদ্ভাবনী দক্ষতাকে আমি স্যালুট জানাই।

—নরেন্দ্র মোদী
প্যারিস থেকে টুইটে

চন্দ্রাভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। মহাকাশযানের উৎক্ষেপণের জন্য ২০১৮ সাল প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হলেও প্রযুক্তিগত পর্যালোচনার পরে কনফিগারেশন এবং অবতরণ অনুক্রমের বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হয় ও আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি পরীক্ষার সময়ে ল্যান্ডারের দুটি পায়ে সামান্য ক্ষতি হয়। তাই প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে পুনরায় উৎক্ষেপণের সময় নির্ধারণ করা হয়। ২২ জুলাই, ২০১৯ সালে সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সময় দুপুর ২টো ৪৩ মিনিটে জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল্ (জিএসএলভি মার্ক-৩)-এর সক্রিয় উড়ানের মাধ্যমে চন্দ্রযান-২ উৎক্ষিপ্ত হয়। এই অভিযানের ব্যাপ্তিকাল ছিল ১ বছর। চন্দ্রযান-২-এর উৎক্ষেপণ ভর ছিল ৩,৮৫০ কিলোগ্রাম, ল্যান্ডার বিক্রমের ভর ১,৩৫০ কিলোগ্রাম, রোভার প্রজ্ঞানের ভর ২৫ কিলোগ্রাম। অরবিটারে থাকা পেলোডগুলি হলো এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার, চন্দ্রপৃষ্ঠে উপস্থিত প্রধান উপাদানগুলির ম্যাপিং-এর জন্য সোলার এক্স-রে মনিটর,

ইসরোর বাঙ্গালি বিজ্ঞানী নীলাদ্রি মৈত্র।

চাঁদের ছায়াযুক্ত অঞ্চলের নীচে চন্দ্রজল-সহ বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি অনুসন্ধানের জন্য ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি এল অ্যান্ড এস ব্যান্ড সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার, খনিজ জলের অণু ও হাইড্রক্সিলের উপস্থিতি অধ্যয়ন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের মানচিত্র তৈরির জন্য ইমেজিং আইআর স্পেকট্রোমিটার।

বিক্রম ল্যান্ডারে থাকা পেলোডগুলি হলো অবতরণ স্থানের নিকটে চন্দ্র-ভূমিকম্প বা চান্দ্র সিসমিক অ্যাক্টিভিটি অধ্যয়ন করার জন্য সিসমোমিটার, চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য তাপীয় পরীক্ষা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের প্লাজমার ঘনত্ব পরিমাপের জন্য র‍্যামবিএইচ- এলপি ল্যাংমুয়ার অনুসন্ধানের সরঞ্জাম, চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলক ও উপগ্রহের মধ্যবর্তী দূরত্বের যথাযথ পরিমাপের জন্য লেজার রেট্রোলেক্টর অ্যারে, চাঁদের এক্সোস্ফিয়ারের বিশদ অধ্যয়ন করার জন্য অ্যাটমোস্ফিয়ারিক কনডেনসেট এক্সপ্লোরার-২, চাঁদের খনিজ ও ভূতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য টেরেইন ম্যাপিং ক্যামেরা-২, চাঁদের বায়ুমণ্ডলের পরীক্ষার জন্য রেডিও অ্যানাটমি অফ্ মুন বাউন্ড হাইপারসেন্সিটিভ আয়নোস্ফিয়ার অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ার দ্বারা দ্বৈত ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও বিজ্ঞান পরীক্ষা বা র‍্যামবিএইচ-ডিএফআরএস এর সরঞ্জাম, অবতরণের জন্য ঝুঁকিমুক্ত স্থান নির্বাচন ও চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি ডিজিটাল মডেল প্রস্তুতের জন্য অরবিটার হাই রেজোলিউশন ক্যামেরা। অবতরণ স্থানের নিকটবর্তী উপাদানসমূহের প্রাচুর্য নির্ধারণ করতে প্রজ্ঞান রোভার দুটি যন্ত্র বা পেলোড বহন করে। (১)

কন্ট্রোলরুমে বসে উৎক্ষেপণের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদারকি করছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা।

ইলেকট্রোঅপটিক সিস্টেমের অন্তর্গত লেজার ইনফ্লুয়েন্সড ব্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপ ও (২) আলফা পার্টিকল্ প্রেরিত এক্স-রে স্পেকট্রোস্কোপ। চন্দ্রযান-২কে মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দেয় জিএসএলভি রকেট বাহুবলী। তারপর ধীরে ধীরে এই মহাকাশযানের বোর্ড-চালিত ইঞ্জিনটির মাধ্যমে তার কক্ষপথ বাড়িয়ে ১৩ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে যানটির ট্রান্স-লুনার ইনজেকশন ঘটানো হয়। ওবার্থ প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে একাধিক কক্ষপথ উত্থাপনের কৌশলগুলি-সহ পৃথিবীর অভিকর্ষণে আবদ্ধ দীর্ঘ পর্বের প্রয়োজন ছিল। কারণ উৎক্ষেপণ ক্ষমতা ও মহাকাশযানের অন-বোর্ড প্রোপালশন ব্যবস্থা। চন্দ্রযান-১ ও মঙ্গল অরবিটার মিশনের জন্য তাদের 'পৃথিবী আবদ্ধ কৌশল' চন্দ্রযান-২তে ব্যবহৃত হয়। ৩ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে প্রথম সেটের পৃথিবীর চিত্রগুলি বিক্রম ল্যান্ডারে এলআই৪ ক্যামেরায় ধারণ করা হয়। উৎক্ষেপণ যানের মাধ্যমে চন্দ্রযান-২কে প্রথমে একটি পার্কিং কক্ষপথে ১৭০ কিলোমিটার অনুসূর ও পরে ৪০,৪০০ কিলোমিটার অপসূরে স্থাপন করা হয়।

ভূকেন্দ্রিক ও চন্দ্রকেন্দ্রিক পর্বদ্বয়ের কক্ষপথগুলিতে পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হওয়ার পর চন্দ্রযান-২ ল্যান্ডার ও রোভারের পরিকল্পিত মসৃণ অবতরণ বা সফট্ ল্যান্ডিং-এর স্থান নির্ধারিত হয় মনজিনাস সি ও সিম্পিলিয়াস এন-এর মধ্যে একটি উঁচু সমভূমিতে যা চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের নিকটবর্তী, ১৫ ডিগ্রির চেয়ে কম ঢালু, ৫০ সেমির থেকে ক্ষুদ্র পাথর ও গর্তের অস্তিত্ব সম্পন্ন, যে স্থানে কমপক্ষে ১৪ দিনের জন্য সূর্যালোক ও নিকটবর্তী ঢালের দীর্ঘমেয়াদি ছায়া অবতরণ যে স্থানে হয় না। চন্দ্রযান-২-এর অরবিটারের নির্মাতা হলো হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস্ লিমিটেড। পরিকল্পনা ছিল চাঁদের কক্ষপথে অরবিটার থেকে ল্যান্ডার পৃথক হওয়ার আগে অরবিটারের উচ্চ (হাই) রেজোলিউশন ক্যামেরা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্য নির্ধারিত স্থানের উচ্চ রেজোলিউশন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করবে। ল্যান্ডার অবতরণের অভিযান সফল হলে, চাকাযুক্ত রোভার চন্দ্রপৃষ্ঠে চলাফেরা করবে এবং সেই সব স্থানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবে।

রোভার সমস্ত তথ্য চাঁদের কক্ষপথে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহ বা অরবিটারের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠাবে। ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ রাত ১টা ৫২ মিনিটে ল্যান্ডারটি চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় ২.১ কিলোমিটার উচ্চতায় নিজের লক্ষ্যপথে বিচ্যুত হয় ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সম্ভবত চন্দ্রপৃষ্ঠে তার ক্র্যাশল্যান্ডিং হয়। ৮টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (যার মধ্যে ২টি হলো চন্দ্রায়ন-১এ ব্যবহৃত যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ) নিয়ে অরবিটারটি সচল থাকে এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ল্যান্ডারের ক্র্যাশল্যান্ডিং-এর ২ সপ্তাহ পরে চাঁদের উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে পরিক্রমণের সময়ে বিশিষ্ট বাঙ্গালি পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্রের নামাঙ্কিত 'মিত্র ক্রেটার'-এর ছবি তোলে। ওই চন্দ্রাভিযানের মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৭৮ কোটি টাকা।

চন্দ্রযান-৩ হলো ইসরো কর্তৃক পরিচালিত ভারতের চন্দ্রাভিযান কর্মসূচির অন্তর্গত তৃতীয় চন্দ্র অন্বেষণ অভিযান। চন্দ্রপৃষ্ঠে ল্যান্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবতরণ, রোভারের নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সক্ষমতা পরীক্ষা এবং নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পাদনা এই অভিযানের উদ্দেশ্য। চন্দ্রযান-৩-এ প্রোপালশন মডিউল, ল্যান্ডার ও রোভার ব্যবহৃত হয়েছে। মোট ভর ৩,৯০০ কিলোগ্রাম। তবে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ বা অরবিটার প্রেরিত হয়নি। ২০১৮ সালে ইসরো চন্দ্রযান-৩ প্রকল্পটি চূড়ান্ত করে। ইসরোর চেয়ারম্যান কে. সিভান জানান যে এই অভিযানের প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ অভিযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রম ল্যান্ডারের অবতরণ সফল না হওয়ার কারণে ভারত সরকারের তরফে জাপানের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ২০২৪ সালে লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন মিশনের ক্ষেত্রে চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রয়োজনীয় অবতরণের জন্য আরেকটি অভিযানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। চন্দ্রযান-৩এর অবতরণস্থল হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ ইসরোর বিজ্ঞানীদের আশা দক্ষিণ মেরু থেকে চাঁদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হবে।

১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সময় দুপুর ২টো ৩৫ মিনিটে জিএসএলভি মার্ক-৩ উৎক্ষেপণ রকেটের সাহায্যে চন্দ্রযান-৩এর উৎক্ষেপণ সৃষ্টি করলো এক নতুন ইতিহাস। ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে চাঁদের কক্ষপথে চন্দ্রযান-৩ এর সন্নিবেশ ঘটতে চলেছে। চন্দ্রযান-৩ হলো ইসরোর তরফে চাঁদে প্রেরিত তৃতীয় আনম্যানড মিশন। প্রাক্তন ইসরো বিজ্ঞানী নাম্বি নারায়ণন জানিয়েছেন যে চন্দ্রযান-৩ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে ৬০০ বিলিয়ন ডলারের গ্লোবাল স্পেস বিজনেস শিল্পে ভারতের অংশীদারিত্ব বহুগুণ বাড়বে যা বর্তমানে মাত্র ২ শতাংশ। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে ভারতে বহু স্টার্ট আপ গড়ে উঠতে পারে বলেও তিনি মতপ্রকাশ করেন। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩এর সফল চন্দ্রাভিযানের পর আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের পর বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারত সেই এলিট ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করবে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মছলন্দপুরের রাজবল্লভপুর হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র নীলাদ্রি মৈত্র বর্তমানে ইসরোয় কর্মরত। ইসরোর তৃতীয় চন্দ্রাভিযানের কর্মযজ্ঞে তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চন্দ্রযান-৩এর সফল উৎক্ষেপণের পরে ইসরোর সব বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। মহাবিশ্বে মহাকাশে ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞানীদের এই সাফল্য ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে গর্বিত করবে এবং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতকে এক উচ্চ শিখরে নিয়ে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। ২০ জুলাই, ২০২৩ তারিখে চতুর্থ অরবিট রেইজিং ম্যানিউভারের মাধ্যমে চন্দ্রযান-৩ উচ্চতর ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। ২৩ আগস্ট বহু প্রতীক্ষীত সেই দিন। চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্রযান-৩এর ল্যান্ডারের সফল অবতরণের প্রতীক্ষায় আজ সমগ্র ভারতবর্ষ।

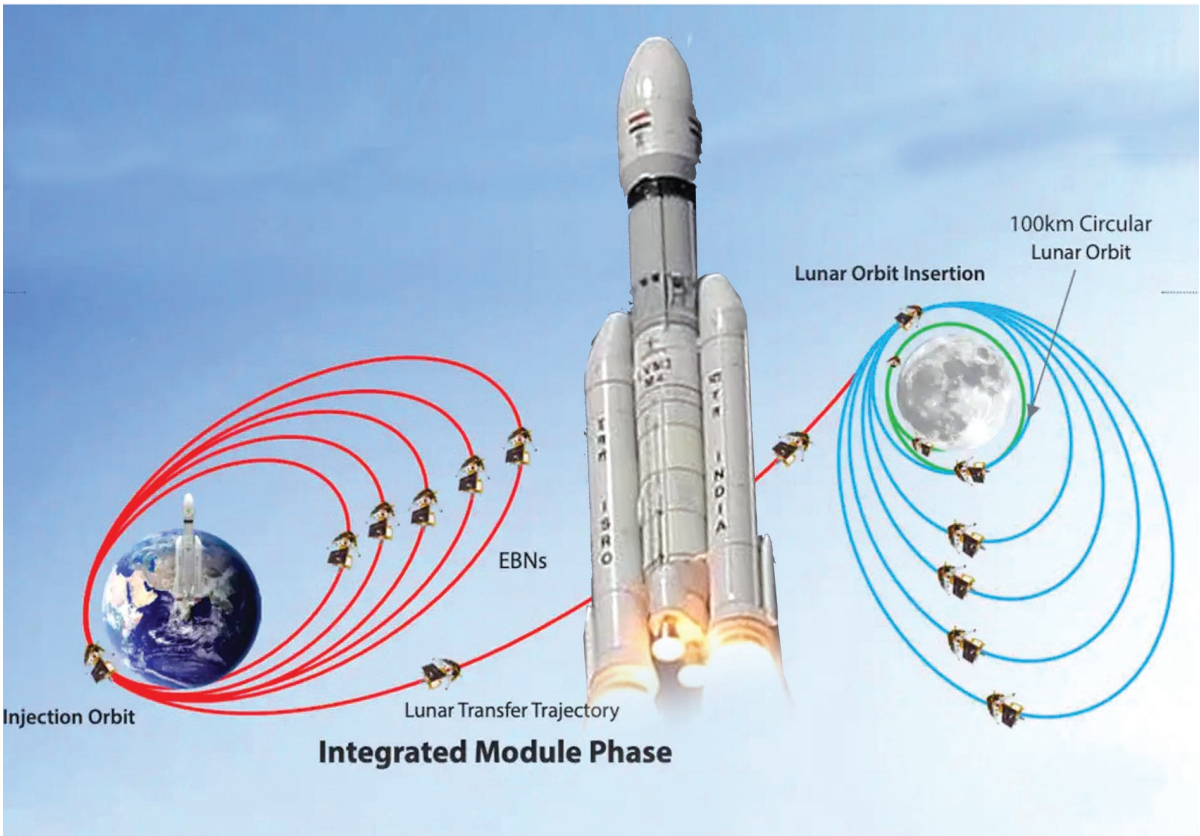

চন্দ্রযান-৩ : ভারতের চন্দ্রাভিযানের নতুন মাইলফলক

রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জী

চন্দ্রযান-৩ ভারতের মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। চাঁদের বুকে মহাকাশযান পাঠানোর প্রতিযোগিতা একসময় শুধুমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সেই তুলনায় অনেকটাই নবীন। মহাকাশ অভিযানের আধুনিক গবেষণা ভারতে শুরু হয় ১৯২০ সালের সময় থেকে। অনেকের মতে ভারতীয় বাঙ্গালি পদার্থবিদ শিশির কুমার মিত্রের স্থল-ভিত্তিক রেডিয়োর মাধ্যমে আয়নোস্ফিয়ারের শব্দ নির্ণয় করার পরীক্ষাকে ভারতের মাটিতে আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানের সূচনা বলে ধরা যেতে পারে। পরবর্তীকালে সি ভি রমন ও মেঘনাদ সাহার পদার্থবিদ্যার কিছু পরীক্ষাও আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে।

স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালে তৈরি হওয়া Department of Atomic Energy (DAE) মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যয়ভার সামলানোর প্রাথমিক কাজের দায়িত্ব পালন করেছিল। মহাকাশ অভিযানের লক্ষ্যে এরপরে ১৯৫৪ সালে হিমালয়ের পাদদেশে তৈরি হয় আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব অবজারভেশনাল সায়েন্স (ARIOS) এবং ১৯৫৭ সালে হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন হয় জাপাল রঙ্গপুর অবজার্ভেটরি। ১৯৫৭ সালেই বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক ১ স্থাপন করে সোভিয়েত যা বিশ্বের মহাকাশ অভিযানকে এক নতুন

"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ ২৩ জুলাই জানান— আগামী ২৩ আগস্ট চাঁদের মাটি ছুঁতে চলেছে চন্দ্রযান-৩। তবে তার আগে পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে চন্দ্রযান-৩। তারপর ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে এগোবে। শেষে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর পরিবেশ পরিচিতি বিচার করে অবতরণের উপযুক্ত স্থানে মসৃণভাবে চাঁদের মাটি ছোঁবে।"

মাত্রা এনে দেয়। মহাকাশ গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতের মহাকাশ গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অনুরোধ করেন বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই এবং সেই অনুরোধেই স্থাপন হয় The Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR)। ১৯৬৯ সালে এই INCOSPAR-এর নাম হয় Indian Space Research Organisation (ISRO) যা তখন পর্যন্ত DAE-এর তত্ত্বাবধানেই ছিল। ১৯৭২ সালে মহাকাশ গবেষণার কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য DAE থেকে আলাদা করে Department of Space (DOS) স্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইকেই ভারতের মহাকাশ গবেষণার জনক বলে গণ্য করা হয়।

ফিরে আসা যাক চন্দ্রযানের কথায়। চন্দ্রযান-৩ নাম থেকেই অনুমান করা যায় এর আগে চন্দ্রযান ১ ও ২ ও রয়েছে। ২০০৮ সালে ৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করে চাঁদের উদ্দেশ্য রওনা দেয় চন্দ্রযান-১। এই চন্দ্রযান-১ এ ব্যবহৃত ISRO-র তৈরি Moon Impact Probe (MIP) চাঁদের মাটিতে জলের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। এই চন্দ্রযান ১ এ MIP ছাড়াও NASA-র তৈরি Moon Mineralogy Mapper (MMM) ব্যবহার করা হয়েছিল। ২০০৯-এ Science পত্রিকায় দাবি করা হয় NASA-র MMM যন্ত্র চাঁদের মাটিতে জলের অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ দিয়েছে কিন্তু তারপরেই ISRO প্রমাণ দেয় তাদের তৈরি MIP যন্ত্র প্রথম এই প্রমাণ দিয়েছে যা পরবর্তীকালে NASA মেনে নেয়।

চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে কোনো দেশের মহাকাশযান পৌঁছতে পারেনি সেখানেই পৌঁছনোর উদ্দেশ্য ২০১৯ সালে ভারতের চন্দ্রযান- ২ যাত্রা শুরু করে। সফলভাবে যাত্রা শুরু করলেও চাঁদের দক্ষিণ প্রান্তের নরম মাটিতে সফট্ ল্যান্ডিঙের সময় চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার ভেঙে পরে। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিযান অসফল হলেও গোটা বিশ্বের কাছে এই অভিযান প্রশংসিত হয়েছিল। এর আগে ২০১৪ সালেও বিশ্বকে অবাক করে ভারত সফল করে মঙ্গল অভিযান যা করতে খরচ হয়েছিল মাত্র ৭৪ মিলিয়ন ডলার যেখানে হলিউডের মহাকাশ নিয়ে একটি সিনেমা বানাতে খরচ হয় ১০০ মিলিয়ন ডলার।

চন্দ্রযান ২-এর ল্যান্ডিঙের সময় ভুলত্রুটি যা ছিল তা সংশোধন করেই শুরু হয় চন্দ্রযান-৩। খুব সহজ ভাবে বললে এই চন্দ্রযান ৩-এ রয়েছে ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ল্যান্ডার মডিউল (LM), Propulsion Module (PM) এবং রোভার রোভারটির নাম হলো প্রজ্ঞান। এই LM-টি চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধের নরম মাটিতে সফলভাবে নামতে পারলে রোভার টি সেটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়াবে এবং বিভিন্ন পরীক্ষা চালাতে থাকবে। উল্লেখযোগ্য বিক্রম সারাভাইয়ের নামেই নামাঙ্কিত হয়েছিল চন্দ্রযান ২-এর ল্যান্ডার, বিক্রম ল্যান্ডার। চন্দ্রযান ৩-এও এই বিক্রম ল্যান্ডার ব্যবহার করা হয়েছে পূর্বের ত্রুটি সংশোধন করে যাতে এটি সফট্ ল্যান্ডিং সফলভাবে করতে পারে।

অপেক্ষা আর কিছু সময়ের, তারপরেই হয়তো চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধের নরম মাটিতে বিক্রমের সফট্ ল্যান্ডিং সফলভাবে হবে। পশ্চিমি দুনিয়ার গর্ব চূর্ণ করে চাঁদের গোলার্ধের মাটিতে উড়বে ভারতের তিরঙ্গা, এই আশা নিয়েই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কাছে ভারতবাসী।

(লেখক পোস্টডক্টরাল রিসার্চ স্কলার টেক্সাস মেডিকেল সেন্টার)

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত মোদী; গর্বিত দেশবাসী

মণীন্দ্রনাথ সাহা

যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন অন্য দেশে গিয়ে সে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হন তখন সেই প্রধানমন্ত্রীর দেশের জনগণ অবশ্যই গর্বিত হন। সেইমতো ভারতবাসী হিসেবে আজ আমরা গর্বিত। ১৪ জুলাই ছিল ফ্রান্সের জাতীয় দিবস বাস্তিল ডে। সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'গেস্ট অব অনার' ছিলেন ফ্রান্স সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাস্তিল দিবস উপলক্ষ্যে প্যারিসের বিজয় তোরণ বা 'আর্ক দ্য ট্রায়াঙ্কে'র সামনের রাজপথে ফরাসি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেয় ভারতীয় জলসেনা, বায়ুসেনা এবং নৌসেনার দলও। সেই সঙ্গে চারটি রাফাল ফাইটার জেট এবং দুটি সি-সেভেনটিন গ্লোবমাস্টারও আকাশপথে ওই মহড়ায় অংশ নেয়।

একদিকে চন্দ্রযান-৩ যখন চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিল, ঠিক তখনই ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে ফ্রান্সে বাস্তিল দিবসের সামরিক কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সব মিলিয়ে ভারতের জন্য ১৪ জুলাই তৈরি হলো এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ওইদিন মোদীর সামনে ফরাসি সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর ২৬৯ জন জওয়ান সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেন। এদিনই ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে বাস্তিল দিবসের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট।

১৩ জুলাই ফ্রান্সে পৌঁছানোর পর ১৪ জুলাই একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর গলায় লিজিয়েঁ দ্য অনারের 'গ্রান্ডক্রস' পরিয়ে দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের এই সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের ক্রস কলকাতায় এসে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সত্যজিৎ রায়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ। এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই সম্মানে ভূষিত হলেন। প্রসঙ্গত, এর আগে মোট ১৩টি দেশ থেকে সেখানকার সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সমগ্র বিশ্বে মোদীর জনপ্রিয়তা যে কতটা উচ্চে উঠেছে তা যেমন জানা গিয়েছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষায়, তেমন দেখা গিয়েছে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট মানুষের প্রতিক্রিয়া ও আচরণে। যেমন, জি-৭-এ অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'মোদী আমাদের বস্'। জো

বাইডেন বলেছেন— ‘আপনি তো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী।’ পাপুয়া নিউগিনির প্রধানমন্ত্রী তো মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন এবং গার্ড অব অনার দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন।

আমেরিকা সফরের সময় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গায়িকা মেরি মিলবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ভারতের জাতীয় সংগীত ‘জনগণমন অধিনায়ক’ গেয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী মেরী মিলবেন মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন।

ফিজির সর্বোচ্চ সম্মান ‘কম্প্যানিয়ন অব দি অর্ডার অব ফিজি’-তে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই প্রথম ফিজির বাইরের কোনও ব্যক্তিত্বকে ওই দেশের সেরা এবং উচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হলো। রাষ্ট্রনেতার এই সম্মান প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর কাছে গর্বের। অন্য একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, জনপ্রিয় বিশ্বনেতাদের দৌড়ে পুনরায় সেরার সেরা নির্বাচিত হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বের জনগণের মধ্যে ৭৬ শতাংশ মানুষ পছন্দ করেন নরেন্দ্র মোদীকে, ৬১ শতাংশ আন্ড্রেস ম্যানুয়েলকে, ৫৫ শতাংশ অ্যান্থনি অ্যালবানিজকে, ৪৯ শতাংশ জর্জিয়া মেলোনিকে, ৪১ শতাংশ জো বাইডেনকে এবং ৩৯ শতাংশ জাস্টিন ট্রুডোকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র ফ্রান্স বা আমেরিকায় সম্মানিত হননি, তিনি ইসলামিক দেশগুলোতেও সেরার সেরা সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। যেমন, ২০১৬ সালে আফগানিস্তান সরকারের প্রধান তাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘গাজি আমির আসানুল্লাহ খান’ পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ২০১৬ সালেই সৌদি আরব ‘অর্ডার অব আব্দুল্লাজিজ’ সম্মানে

ভূষিত করে। ২০১৯ সালে ইউএই সরকার সেখানকার সর্বোচ্চ সম্মান ‘অর্ডার অব জায়েদ’ প্রদান করে মোদীকে সম্মানিত করেছেন। ওই সালেই বাহরিন সরকার তাদের সর্বোচ্চ সম্মান ‘কিং হামাদ অর্ডার অব দ্য রেনেসাঁ’ প্রদান করেন। ২০২৩ সালে মিশরের সর্বোচ্চ সম্মান ‘অর্ডার অব দ্য নাইলে’ ভূষিত হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

কিছুদিন আগে সমগ্র বিশ্ব দেখেছে আমেরিকার পার্লামেন্টে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ দেওয়ার দৃশ্য। সেখানে দেখা গেছে মোদীর আগমনে পার্লামেন্ট জুড়ে শুধুই করতালি আর ‘মোদী মোদী’ ধ্বনি। একঘণ্টার বক্তৃতার মাঝে কুড়িবারের বেশি উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছেন আমেরিকার জনপ্রতিনিধিরা। বক্তৃতার শেষে ভারতমাতা কী জয়, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়েছেন তাঁরা। সবশেষে মোদীর অটোগ্রাফ সংগ্রহের পালা প্রভৃতি সবকিছুর সাক্ষী থেকেছে আমেরিকার পার্লামেন্ট।

কথায় বলে খাঁটি সোনা চিনতে জহুরির চোখ লাগে। সেই চোখে আমেরিকার দিগ্‌গজ ব্যক্তিরাও বলছেন— ‘মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।’ যেমন— ‘ভারতের ভবিষ্যৎ অনেক বেশি উজ্জ্বল, ভারতের জন্য সঠিক কাজ করা মোদীর আমি ফ্যান’ (এলন মাস্ক, টেসলা)

‘প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করলাম। করোনাকালে ভারতের সংক্রমণকে প্রতিরোধ, খাদ্য বণ্টনের সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইকে সাধুবাদ জানাই।’ (নামিস নিকোলাস তালেব, লেখক)

‘আমি খুবই খুশি নরেন্দ্র মোদীর মতো এক রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করে। তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবনাতে পরিপূর্ণ একজন মানুষ’ (নইল ডি গ্রাসে, জ্যোতিপদার্থবিদ)।

মোদীজী আসলে কী তা বুঝতে পারছেন বিশ্বের তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বরাও। বিদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ৯ বছর দেশ শাসনের পরেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের জনগণের প্রথম পছন্দ নরেন্দ্র মোদী। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২৪-এর লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পছন্দ কে? এজন্য সম্প্রতি এবিপি—সি ভোটার সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে তা হলো, নরেন্দ্র মোদী ৪৯ শতাংশ, রাহুল গান্ধী ১৮ শতাংশ। যোগী আদিত্যনাথ ০৬ শতাংশ। অরবিন্দ কেজরিয়াল ০৫ শতাংশ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ০২ শতাংশ, নীতীশ কুমার ০১ শতাংশ এবং অন্যান্যরা ১৯ শতাংশ। বিরোধীরা মোদীর যতই নিন্দা করুক না কেন, মোদীজীর পাশে আছে দেশের মানুষ। বিশ্বের দরবারে ভারতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই এই মুহূর্তে এই সফলতা প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। তারা বার বার মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী রূপে দেখতে চায়। ■

পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্য পালনীয়

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

আমাদের সমাজজীবন চারটি আশ্রমে বিভক্ত। আশ্রমগুলি মানুষকে পরিপূর্ণতার দিকে, লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। মানবজীবনের লক্ষ্য কী? দেবত্বে উন্নীত হওয়া। চারটি আশ্রম কী কী? —ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাসকাল হলো ব্রহ্মচর্য। বিদ্যাভ্যাস সমাপনান্তে গৃহে ফিরে সংসারজীবন যাপনকাল গার্হস্থ্য। বনে গিয়ে অধ্যাত্ম-উপলব্ধি করা বানপ্রস্থ আর লোকালয়ে ফিরে এসে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই বন-লব্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞান বিতরণ করে মানুষকে ভগবৎমুখী করে তোলা সন্ন্যাস। এই চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ। কারণ গার্হস্থ্য আশ্রমের উপর বাকি আশ্রমগুলি নির্ভরশীল। তাই সর্বাগ্রে গার্হস্থ্য জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত, ধর্মাবৃত করে তুলতে হবে। গৃহস্থকে সৎ-সুন্দর করে গড়ে তোলাই সংহিতাকারদের কর্ম। মনু প্রভৃতি সংহিতাকাররা এই কাজটি করতে গিয়ে গৃহস্থের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান দিয়েছেন। কী সেই পঞ্চমহাযজ্ঞ— ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। গৃহস্থকে প্রতিদিন এই পঞ্চমহাযজ্ঞ করতে হবে। যে গৃহস্থ এই পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রতিদিন করেন তিনি হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হন না। হিংসাজনিত পাপ কী? গৃহস্থালীর কাজে উনুন, শিল-নোড়া, সম্মার্জনী, উদূখল-মুষল, জলপাত্র প্রভৃতির ব্যবহারে বহু কীটপতঙ্গের প্রাণনাশ হয়— যা আমরা দেখেও দেখি না। সেই সমস্ত পাপ স্খালনের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান। যজ্ঞ কথার অর্থ ত্যাগ— sacrifice কিন্তু মহাযজ্ঞের অর্থ duty, কর্তব্য।

অধ্যয়ন-অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। অন্ন-জল সহ পিতৃপুরুষের তর্পণ পিতৃযজ্ঞ। হোমের নাম দেবযজ্ঞ। পশু পাখিকে খাদ্যদান ভূতযজ্ঞ। আর অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ। ঋষিকুল, পিতৃকুল, দেবকুল, প্রাণীকুল ও অতিথিকুল গৃহস্থের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন। গৃহস্থের কর্তব্য তাদের প্রত্যাশা সাধ্যমতো পূরণ করা। তাই মনু বলেছেন, যে গৃহস্থ প্রতিদিন এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তিনি হিংসারূপ পাপকর্মে লিপ্ত হন না। পঞ্চমহাযজ্ঞ তাই গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য নিত্যকর্ম।

একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পঞ্চমহাযজ্ঞ নিজের ও সমাজের কল্যাণের জন্য ঋষি নির্দিষ্ট সুন্দর-সার্থক একটি ব্যবস্থা। প্রথমে

বলা যায়, ব্রহ্মযজ্ঞের কথা। মনু বলছেন, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞে ঋষিঋণ পরিশোধ হয়। প্রাচীন ঋষিরা যে অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদাদি গ্রন্থের মধ্যে সঞ্চিত রেখে গেছেন তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। আর সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। অধ্যয়নের মাধ্যমে আত্মোন্নতি আর অধ্যাপনার মাধ্যমে সমাজোন্নতি। অধ্যাপনার মাধ্যমে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় সমাজে শাস্ত্রজ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে, তাতে সমাজের উন্নতি হয়। তাই ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিত্য কর্ম। সহজ কথায় প্রতিদিন কোনো না কোনো সৎগ্রন্থ পাঠ এবং তা নিয়ে আলোচনা। পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে।

এবার বলি দেবযজ্ঞের কথা। দেবতার উদ্দেশে প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্বক হোম করা, সহজ কথায় নিত্য পূজার্চনা করা। দেবতা আছেন, এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস রেখে দেবপূজা করলে নিজের মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। তাই দেবপূজা নিত্যকর্ম। পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞের অনুরূপ। পিতৃপুরুষদের প্রতি নিত্যতর্পণ শ্রদ্ধা-সহ স্মরণ ও মনন-নিদিধ্যাসন। এর ফলে পিতৃপুরুষদের গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব হয়। গৃহস্থ তাঁর কুলধারা বজায় রাখতে সক্ষম হন। ভূতযজ্ঞ কী? সমাজে পতিত মানুষ, চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাশ, ভিক্ষুক, অনাথ, কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং কুকুর, কাক, কৃমিজাতীয় কীট প্রভৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্নদান গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য। অবশেষে নৃযজ্ঞ— অতিথি সৎকার। অর্থাৎ গৃহে অতিথি এলে তাকে আসন, পাদ্যার্ঘ (পা-ধোয়ার জল), ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্নব্যঞ্জন দান করতে হবে। গৃহস্থ যতই দরিদ্র হোন না কেন, অতিথি-সৎকার তার অবশ্য কর্তব্য। অন্নদানের সামর্থ্য না থাকলেও আসন, পাদ্যার্ঘ্য, তৃণশয্যা, প্রিয়বাক্য, পানীয় জল— এইটুকু দিতে তো কোনো অসুবিধা কারও নেই। এখন প্রশ্ন অতিথি কে? —গৃহস্থের গৃহে যে ব্যক্তির আগমনের কোনো তিথি (নির্দিষ্ট সময়) নেই এবং যিনি এক রাত্রির অধিক গৃহস্থ-গৃহে অবস্থান করেন না; তিনিই অতিথি। সহজ কথায় যিনি পরের গৃহে একরাত্রি মাত্র বাস করেন তিনিই অতিথি।

এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ভগবান মনু পরিবার ও সমাজের বিকাশ ও বন্ধন নিশ্চিত করেছেন। ভারতে পরিবার ও সমাজই মুখ্য, ব্যক্তি গৌণ। ভারতীয় সভ্যতা পরিবারকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক। কতকটা মৌচাকের মতো, পিপীলিকার জীবনযাত্রার মতো। এদের সমস্ত কর্ম পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মৌমাছি ফুলের মধু এনে তার চাকে সঞ্চিত করে; পিপীলিকা তার খাদ্যসামগ্রী যা পায় বাসায় নিয়ে আসে। এখন প্রশ্ন, তাবলে কি তারা খায় না? না খেলে বাঁচবে কী করে? তারাও খায় কিন্তু পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, অন্যের জন্য সঞ্চয়ও করে। ভারতের সমাজ এমনই। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতায় আমাদের আগ্রহ। আমরা সকলকে নিয়ে বাঁচতে চাই— অন্ধ, আতুর, বেড়াল, কুকুর সবই আমাদের পরিবার-পরিজন। আমাদের মুনি ঋষিরা শিখিয়েছেন— পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য নয়। সমস্ত জীবের অধিকার এই জগতে সমান। কারণ এ জগৎ সকল জীবের আধার। 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'— বেদ আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে। মন্বাদি স্মৃতিকাররা আমাদের এই বৈদিক শিক্ষাকে ভালো করে বুঝিয়েছেন। এই শিক্ষা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সার্বিক বিকাশ ঘটে তার ব্যবস্থা করেছেন। ▯

প্রসিদ্ধ ও জাগ্রতা দেবী
পাতালভেদী শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালী

দীপা প্রামাণিক

পূর্ব ভারত তন্ত্রক্ষেত্র। এখানে বিরাজ করছেন মা কামাখ্যা। তাছাড়া অসংখ্য শক্তিপীঠ ছড়িয়ে রয়েছে পূর্বভারতে। বঙ্গপ্রদেশে তো শক্তিপীঠ ও শাক্ত দেবীর মন্দির যে কত আছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচীনকাল থেকে এই বাঙ্গালির হাড়েমজ্জায় শক্তি সাধনার ধারা প্রবহমান। এই তো পাঁচ-ছ'শো বছর আগে শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালিকে বৈষ্ণব সাধনা শেখালেন। বাঙ্গলার শাক্তরা তাই বৈষ্ণবদের দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। যাক সেকথা, শাক্তদেব-দেবীর মধ্যে বাঙ্গালির সর্বপ্রধান পূজা দুর্গাপূজা। তারপরেই কালীপূজা। একটি মজার প্রবাদ আছে বাংলায়— 'যেখানে বাঙ্গালি, সেখানে মা-কালী।'

বাঙ্গালি মুখে যতই হরিনাম সংকীর্তন করুক না কেন তার মজ্জায় রয়েছে মাকালী। বাঙ্গলার পাড়ায় পাড়ায় মাকালী মন্দির, ঘরে ঘরে কালীপূজা। বাঙ্গলা তথা ভারতের নবজাগরণের পুরোধা পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তো কালীসাধক ছিলেন। এই বাঙ্গলায় দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির, কালীঘাটে কালীমন্দির। আরও কত কালীমন্দির আছে তার ঠিক নেই! শ্রীরামকৃষ্ণ তো শ্মশানকালীকে ঘরের মেয়ে ভবতারিণীতে পরিণত করে নিয়েছেন। রামপ্রসাদও সেই পথের পথিক। তাঁর ঘরের বেড়া বাঁধার কাজে মা কালী এসে সাহায্য করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তো মা কালী রীতিমতো কথা বলতেন। সমগ্র বাঙ্গলায় কালীর পূজা, আরাধনা, অর্চনা, সাধনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শব্দটির উৎপত্তি তো 'কালীক্ষেত্র' থেকে। শুধু কলকাতায় কত কালীবাড়ি, কালীমন্দির আছে তা একবার ভেবে দেখার বিষয়। তেমনই কলকাতার আশেপাশেও আছে কত কালীমন্দির। কলকাতা থেকে দক্ষিণে লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে ৩৫/৪০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বহরু স্টেশন। সেই স্টেশন থেকে ৫/৬ কিলোমিটার দূরে আছে এক অতি প্রাচীন কালীমন্দির— ময়দা কালীবাড়ি মন্দির। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা দক্ষিণাকালী। দক্ষিণাকালীর দাক্ষিণ্য এতদঞ্চলের এবং বহু দূর দেশের ভক্তরা লাভ করে চলেছেন।

ময়দা গ্রামের কথা একটু বলা যাক। গ্রামটি আদি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো বছর আগে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা এখানে একটি বন্দর গড়ে তোলে তাদের ব্যবসার কাজের জন্য। পর্তুগিজরা প্রথমে ভারতে আসে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। তারপর আসে ওলন্দাজ, ফরাসি বণিকরা, সবশেষে ইংরেজ। পর্তুগিজরা ব্যবসা বাণিজ্যের আড়ালে বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, ক্রীতদাস কেনা-বেচার ব্যবসা করতে থাকে। অবশেষে বাদশা শাহজাহান তাদের দেশছাড়া করেছিলেন। তারা এই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশ জাঁকিয়ে ব্যবসা করছিল। সেই সময় ময়দাতে বন্দর করে। পর্তুগিজ ভাষায় ময়দা শব্দের অর্থ বন্দর। তাই এই গ্রামের নাম হলো ময়দা। তখন এইসব অঞ্চল জলা-জঙ্গল-জনমানবশূন্য। কলেরা, ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান। ধীরে ধীরে জনবসতি বাড়তে থাকে। আজ ময়দার ভালোই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বেশ বড়ো জনবহুল গ্রাম। ময়দা যেতে গেলে যে বহরু রেলস্টেশনে নামতে হয়। সেই বহরু গ্রামেই মোয়ার জন্ম। হয়তো মায়ের দাক্ষিণ্যেই মোয়া।

এবার বলা যাক ময়দা কালিবাড়ির কথা। একটি ছোটো আটচালা মন্দির। বর্তমানে মন্দিরের সামনে একটি সুন্দর নাটমন্দির তৈরি হয়েছে। নাটমন্দিরের ডানদিকে মহাদেবের একটি প্রাচীন আটচালা মন্দির। মন্দিরের প্রাঙ্গণ বেশ খোলামেলা। অনেক দোকান মন্দিরের ভিতরের প্রাঙ্গণে, বাইরের জায়গাতেও। রাস্তার ধারেও বহু দোকান। মায়ের দাক্ষিণ্যে ব্যবসায়ীরা করে-কম্মে খাচ্ছেন। পুণ্যার্থীদেরও খাওয়াচ্ছেন নগদ পয়সার বিনিময়ে। এখানকার ভোগের একটা আলাদা স্বাদ আছে। বাড়িতে যত কায়দা

করেই রাঁধি না কেন ঠিক ভোগের রান্নার মতো হয় না। কেন জানি না। এটাই হয়তো মায়ের দাক্ষিণ্য। মন্দিরের এক প্রান্তে আছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তবে এটি অর্বাচীন। কালীঘাটেও কালীমন্দির চত্বরে রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করছেন। শাস্ত্রকারদের মুখে কালীকৃষ্ণ উভয়েই মোক্ষের দেবতা শোনা যায়, তাই একত্র বসবাস। তাহলে কৃষ্ণ মন্দিরে কালী থাকেন না কেন? এটা বোধহয় বৃথা তর্ক। ময়দা কালী মন্দিরে বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। মায়ের কাছে আসতে কারও মানা নেই। মায়ের কাছে কিছু চাইতেও মানা নেই। দেওয়া না দেওয়া তো তাঁর ব্যাপার। তবে শোনা যায় বহু লোক তাঁর কাছে প্রার্থনা করে অনেক কিছু পেয়েছেন। স্ত্রী, সন্তান, জমিজমা, ধনসম্পদ আরও কত কী। কিন্তু যত লোক পেয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশি লোক শূন্য হাতে ফিরেছেন, মন খারাপ করে-- এদের কথা কেউ বলেন বলে শোনা যায় না। সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে— 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী', যার যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি।

মন্দিরে মায়ের কোনো মূর্তি নেই। অর্থাৎ শায়িত শিবের বুকে পা তুলে দিয়ে সঙ্কোচে জিভ কাটা, চতুর্হস্ত বিশিষ্টা, মুণ্ডমালিনী, এলোকেশী মা-কালীর চিরপরিচিত মূর্তি এখানে নেই। গর্ভগৃহে মাটির তলায় বেশ দু-চারধাপ নামলে একটি চৌবাচ্চার মধ্যে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে প্রোথিত একটি আয়তাকার, প্রায় ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি চওড়া, ৩ ইঞ্চি পুরু শিলাখণ্ড। তার আপাদমস্তক সিঁদুর মাখানো বেশ মোটা করে। কামাখ্যা মায়ের মূর্তিও ঠিক এইরূপ। গর্ভগৃহে চৌবাচ্চার ভিতর অবস্থিত একখণ্ড শিলা। আমাদের ধর্ম-দর্শন- আধ্যাত্মিকতা এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে সুযোগ দেননি। কারণ আমাদের শাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি নেই। তাঁর অসংখ্য আকার, অনন্ত মহিমা। অসংখ্য আকার বিশিষ্ট বলেই তিনি নিরাকার। নিরাকার মানে আকার হীন নন। এই গর্ভগৃহে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে মায়ের পূজা দেন ভক্তরা। আর কামনা করেন ধন-জন-পুত্র-কন্যার। মায়ের আশীর্বাদে সন্তানসন্ততি লাভ হলে ভক্তরা বাদ্যিবাজনা করে সাধ্যমতো পূজার সামগ্রী ও প্রসাদ-সহ একটি মাটির গোপালমূর্তি নিয়ে মায়ের কাছে যায় মানসিক চোকাতে। একটি কথা বহু লোকের মুখ থেকে শোনা যায় যে, ময়দা মায়ের কাছে পুত্র-কন্যা প্রাপ্তির জন্য আকুল হয়ে কাঁদলে মা ঠিক একটি সন্তান পাঠিয়ে দেন। আসলে মাও চান তাঁর ভক্ত সন্তানরা যেন কেউ সন্তানহীন না থাকে। তাই এই মন্দিরে মায়েদের খুব আসা-যাওয়া। মায়ের এই প্রোথিত শিলাখণ্ড মূর্তির নাম পাতালভেদী দক্ষিণাকালী। অর্থাৎ পাতালভেদ করে মা এখানে উঠেছেন সন্তানের দুঃখ মোচনের জন্য। তিনি সন্তানের দুঃখ মোচন করেই শান্তি আনেন তাদের জীবনে। এই শিলাখণ্ড যে দেবীকালীর অবস্থান সে সম্পর্কে ও সুন্দর একটি লোককথা প্রচলিত আছে— স্থানীয় ধনী ব্যক্তিরা সেই বাণিজ্য চালিয়ে গেলেন। পণ্যসামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— মধু, লবণ, কাঠ, মোম প্রভৃতি। এই ব্যবসা করে স্থানীয় ধনী জমিদার রায়চৌধুরীরা আরও ধনী হন। ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যে নৌকা করে তাঁরা প্রায়শই যাতায়াত করতেন।

একদিন এক চলমান বজরা থেকে জমিদারবাবু দেখেন নদীতীরের বকুলগাছের ডালে একটি ছোটো মেয়ে দোল খাচ্ছে। জমিদারবাবু মাঝি-মাল্লাদের কাছে থেকে জানলেন যে মেয়েটি ডাইনি। ওকে কেউ কোনো দিন ধরতে পারে না। জমিদারবাবু নীরব হলেন। নদীর তীরে এমন ভূত-প্রেত, ডাইনি বাস করে। কিন্তু রাতে সেই মেয়েটি স্বপ্ন দিল জমিদারবাবুকে যে সে আসলে দক্ষিণাকালী। ওই বকুলগাছেই থাকে। তার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে দিতে হবে। বকুলগাছের তলায় হবে মন্দির। আর বকুল গাছের গোড়ায় খুঁড়লে পাবে একটি শিলাখণ্ড। ওই শিলাখণ্ডেই তাঁর অধিষ্ঠান। ওটিকেই পুজা করতে হবে ভক্তিভরে। জমিদারবাবু স্বপ্নে যেমন আদেশ পেলেন তেমনভাবেই মন্দির তৈরি করেছিলেন। বকুলগাছের তলায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়েছিলেন একটি শিলাখণ্ড— যা আজও ওই মন্দিরের গর্ভের মধ্যে অবস্থিত। শিলাখণ্ডের চারদিকে দেওয়াল তুলে তৈরি হয়েছে মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহের অবস্থিত শিলাখণ্ডকে চারদিকে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাটি ভেদ করে উঠেছিল তাই পাতালভেদী নাম। কেউ কেউ বলেন সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা নাকি ১১৭৬ বঙ্গাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। এসব কথার সত্যতা যাচাই করতে যাওয়া আজ বাতুলতা মাত্র। শুধু এইটুকুই বলা যায়— মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে আপনার একটি অধ্যাত্ম অনুভূতি হবে। মন্দিরের প্রাচীনত্ব, মন্দিরের পরিবেশ এখন অধ্যাত্ম অনুভূতি সৃষ্টির সহায়ক। মন্দিরে পুরোহিতমশাই প্রত্যেক পুণ্যার্থীর নাম-গোত্র উল্লেখ করে তাঁকে দিয়ে মন্ত্র বলিয়ে মায়ের পুজা করিয়ে দেন। অধিকাংশ মন্দিরে এখন এত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা হয় না। প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে দু'টা পর্যন্ত পূজা হয়। সন্ধ্যায় নিত্যপূজা ও আরতি হয়। বিশেষ পূজা হয় দীপাবলির রাতে। বৈশাখে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার উৎসব জাঁকজমক-সহ পালিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে আছে একটি শানবাঁধানো ঘাট বিশিষ্ট পুষ্করিণী। ভক্তরা স্নান করেন তাতে। সুন্দর পুকুরটি এখন ভক্তদের উৎপাতে ক্রমে অসুন্দর হয়ে উঠেছে। আমাদের স্বভাব হলো সুন্দরকে অসুন্দর করে তোলা। ভারতের তীর্থ আর মন্দির দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থিত এই মন্দির আজও সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে। বহু মানুষের যাতায়াতই তার প্রমাণ। □

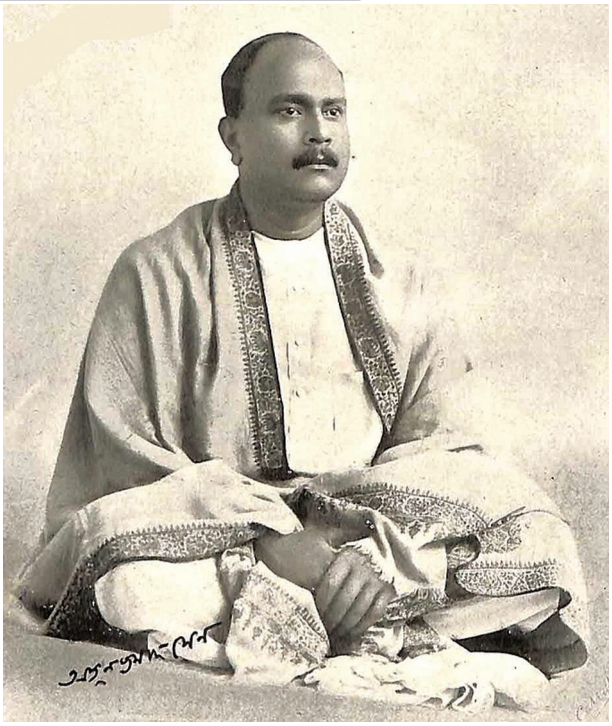

স্বাদেশিকতায় কবি অতুলপ্রসাদ সেন

দীপক খাঁ

বাংলা সংগীতে রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যাঁর নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তিনি অতুলপ্রসাদ সেন। বাংলা গানে তিনি একটি বিশিষ্ট সংগীত রীতির প্রবর্তন করেন, তা অতুলপ্রসাদী সুর নামে খ্যাত।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ২০ অক্টোবর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় কবির জন্ম। পিতা রামপ্রসাদ সেন। তাঁদের আদি নিবাস ফরিদপুরের মগরায়। বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে মাতামহ কালীনারায়ণের স্নেহে যত্নে প্রতিপালিত হন। ভগবদ্‌ভক্ত কালীনারায়ণ ভক্তিগীতি রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর সকল গুণই দৌহিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পরে সার্থকতা লাভ করে। অতুলপ্রসাদ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কিছুদিন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশে বিলেতে যান। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বিলেত থেকে ফিরে প্রথমে কিছুদিন কলকাতায় এবং পরে রংপুরে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

যৌবনে লক্ষ্ণৌবাসী হন এবং সেখানেই আইন ব্যবসা আরম্ভ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কালক্রমে তিনি আইন ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন ও লক্ষ্ণৌয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আউধ বার অ্যাসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলের সভাপতি হয়েছিলেন। পেশাগত সাফল্য লাভের সুযোগে অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ নগরের সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং নানাভাবে সমাজের সেবা করেন। তাঁর গৃহই হয়ে উঠেছিল গরিব সারস্বত মণ্ডলীর মিলন কেন্দ্র।

উপার্জনের বেশিরভাগ অর্থই তিনি ব্যয় করতেন স্থানীয় জনসাধারণের সেবার কাজে। পরবর্তীকালে নিজের বইয়ের স্বত্ব ও বাসভবনটি সমাজসেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। নগরবাসী তাঁর গুণ ও প্রতিভার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছিল তাঁর নামে তাঁর বাসস্থানের সামনের রাস্তাটির নামকরণ করে। জীবিতকালে এইরূপ সম্মানলাভ বিরল ঘটনা। সংগীত ছিল অতুলপ্রসাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। নিজের রচিত গানে নিজেই সুর যোজনা করতেন। বাংলার বাউল ও কীর্তনের সুরের সঙ্গে হিন্দুস্থানি সংগীতের সুর ও ঢং মিশিয়ে তিনি নিজস্ব সংগীতরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। তাই সুপরিচিত অতুলপ্রসাদী সংগীতরীতি।

অতুলপ্রসাদের রচিত গানগুলিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো— স্বদেশি সংগীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান। তঁর স্বদেশি সংগীতগুলি স্বদেশি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাতীয় চেতনা জাগরণে তাঁর 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে, আ-মরি বাংলা ভাষা' প্রভৃতি গানগুলির অবদান অপরিসীম। সারাজীবনে প্রায় দু'শো গান রচনা করেন। তাঁর গানগুলি সংগৃহীত হয় 'কয়েকটি গান' ও 'গীতিপুঞ্জ' সংকলনে। সমস্ত গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন 'কাকলি' নামের গ্রন্থমালায়।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সংগঠকদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম। সম্মেলনের মুখপত্র উত্তরার তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। সম্মেলনের কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গেও তিনি এককালে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ২৬ আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেন।

তাঁর রচিত গানের সংখ্যা মাত্র ২০৬টি। ১৯২২-২৩ সালে সাহান দেবী ও হরেন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে তাঁর গানের রেকর্ড প্রকাশ হয়। ▯

সিন্ধুসভ্যতা থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্ণালংকারের সমান কদর

হীরক কর

পশ্চিমবঙ্গের কারিগরদের তৈরি হালকা সোনার গয়না বিশ্বের বাজারে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু সেই গয়নার সিংহভাগই এখানকার বিক্রেতাদের রপ্তানি করতে হয় মুম্বই, চেন্নাই-সহ আরও কিছু রাজ্যে। যার ফলে মুনাফার একটা বড়ো অংশই হাতছাড়া হয়ে যায় রাজ্যের গয়না ব্যবসায়ীদের। শিল্পমহলের মতে, বিশ্বের ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবেই এই লোকসান স্বীকার করতে হচ্ছে তাঁদের। সেই পরিস্থিতিই এবার বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে তারা। এ জন্য কলকাতায় 'বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল জুয়েলারি শো' প্রদর্শনীর আয়োজন করছে স্বর্ণশিল্প বাঁচাও কমিটি এবং বড়বাজার জেম অ্যান্ড জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিভিন্ন দেশের পাইকারি গয়নার ক্রেতাদের। লক্ষ্য, রাজ্যের কারিগরদের হাতের কাজ তুলে ধরে গয়নার আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করা।

স্বর্ণশিল্প বাঁচাও কমিটির কার্যকরী সভাপতি বাবলু দে বলেন, 'তার মধ্যেও ২০২১-২২ সালে রাজ্য থেকে ৯৯.৩০ কোটি ডলারের গয়না রপ্তানি হয়েছে।' সারা দেশ থেকে দামি পাথর ও গয়না রপ্তানির অঙ্ক প্রায় ৫০০০ কোটি ডলার বলে জানান জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আশিস পেথে। তিনি বলেন, 'রপ্তানির পরিমাণ ১০,০০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে কেন্দ্র। গয়না ব্যবসায়ীরাও সেই লক্ষ্য সমানে রেখেই নিজেদের প্রস্তুত করছেন।'

এই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, দুবাইয়ের গয়নার পাইকারি ব্যবসায়ী জারা জুয়েলারির প্রতিনিধি শাকিল আহমেদের সঙ্গে। তিনি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের কারিগরদের হাতের কাজ করা হালকা সোনার গয়নার খুব ভালো চাহিদা রয়েছে তাদের দেশে। এই প্রদর্শনীতে এসে রাজ্যের গয়না রপ্তানিকারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পেরে তিনি খুশি। এই যোগাযোগ পশ্চিমবঙ্গের গয়না শিল্পের কাছেও ভালো সুযোগ এনে দেবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

কর্ম জগতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন,

ফ ঃ ৫

কত রকমের নতুন পেশা তৈরি হয়েছে এবং মানুষ সেই পেশায় সফলও হচ্ছেন। সেইরকমই একটি পেশা হলো জুয়েলারি ডিজাইনিং। পোশাক, জুতো, ব্যাগ ইত্যাদির সঙ্গে মানানসই গয়না এখন সাজসজ্জার অপরিহার্য দিক। মেয়েদের সাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গয়না। ভারী বা হালকা যে কোনো গয়নাই নারীর সৌন্দর্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। সোনা, রুপার মতো মূল্যবান ধাতুর গয়নাই হোক বা ইদানীংকালের অক্সিডাইজ মেটালের কৃত্রিম গয়না, সবকিছুই কিন্তু মহিলাদের কাছে সমান প্রিয়। এই গয়নাগুলি তৈরির পিছনে যে শিল্পীরা আছেন তাদেরই পোশাকি নাম হলো জুয়েলারি ডিজাইনার। প্রাচীনকাল থেকেই বহু মানুষ এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কিন্তু আগে তাদের এতো পরিচিতি ছিল না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই শিল্পীরাও এখন জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন এবং নিজেদের শিল্পকর্ম দুনিয়ার সামনে তুলে ধরে খ্যাতি অর্জন করছেন।

সভ্যতার শুরু থেকে বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহিলারা গয়নাকে সাজের অঙ্গ এবং পুরুষেরা নিজের প্রয়োজনীয়তা সামনে রেখে নিজের অলংকরণ করতে গয়নাকে বেছে নিয়েছে। প্রাচীন সভ্যতায় চোখ ফেরালে দেখা যায়, গৃহচিত্র থেকে শুরু করে হাজার বছর ধরে নানা ধরনের শিল্পে গয়নার ব্যবহার হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতা বলতে এখানে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, সিন্ধু সভ্যতার কথা বলছি, এসবের যে নমুনা আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায়, সেই প্রাচীন যুগ থেকে পুরুষ ও নারী নানা ধরনের গয়নায় নিজেকে সজ্জিত করেছে। মিশরের মমির দেহে নানা অলংকার দেখা গেছে, এছাড়া মন্দিরের গায়ে যেসব চিত্র-ভাস্কর্য দেখা যায়, তাতে নানা ধরনের নকশায় সংবলিত গয়নার চিত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। এই গয়নাচিত্রের নমুনা দেখে বোঝা যায়, সে সময়ে ফুল, পাতা, বীজ, মাটি, পশুপাখির হাড়, পাখির পালক ও বিভিন্ন ধাতুর বাবহার ছিল গয়নায়। তারপরও ধীরে ধীরে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গয়না শিল্পের নানা ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। যেমন প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ।

আনুমানিক সাত হাজার বছর আগের ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই সময়ে পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি অঙ্গভূষণ ব্যবহার করত। যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং সেই অঙ্গভূষণের মধ্যে শিরোভূষণ ও কণ্ঠভূষণের আলংকারিক নকশাগুলো বিখ্যাত ছিল এবং এগুলো ব্রোঞ্জ, পিতল, দস্তা, পশুর চামড়া, হাড়, কাঠ-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হতো। সম্ভবত সেই সময় থেকে সোনার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে নারীরা গয়নার উপকরণ হিসেবে নুড়িপাথর, পাখির পালক, বীজ, ফুল, লতাপাতা, পশুপাখির হাড় ব্যবহার করে নিজেদের হাতে গয়না বানাতে শুরু করে।

অলংকার কোনো আবশ্যিক নয়। অলংকার মানুষের সাজসজ্জার মাধ্যম, যা মানুষের দৈহিক সৌকর্য বৃদ্ধি করে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি অলংকার ব্যবহার করে। জাতি ও সংস্কৃতি ভেদে অলংকারের গড়ন ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। আধুনিক সভ্যতায় সোনা ও রুপোর অলংকার সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার লোহার তৈরি গয়নার বিশেষ কদর ছিল। বিংশ শতাবাদীর শেষাংশে প্লাটিনামের গয়না তৈরিও শুরু হয়। হিরা-সহ নানা ধরনের মণি-মুক্তা যুক্ত করে গয়নার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

ভারতীয় জুয়েলারির উল্লেখ রয়েছে মহাভারত ও রামায়ণেও। প্রাচীনকালে গহনাগুলো নুড়ি, পশুর চামড়া, খোলস, স্ট্রিং ও স্ফটিক অথবা পাথর দিয়ে তৈরি হতো। তদুপরি, প্রাথমিক ভাবে পুরুষরা এই উপাদানগুলো তাদের দেহকে শোভিত করতে, স্বীকৃতি, শক্তি এবং নেতৃত্বের মর্যাদার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করত।

আঠারো শতকের পরবর্তী সময়টিকে গয়নার আধুনিক যুগ বলা হয়। এ সময় ভারতে ইংরেজদের আগমন ঘটে। তার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের সভ্যতার প্রসার লাভ করে। পাশ্চাত্য ঘরানার অলংকার শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দামি পাথর ও অল্প সোনার ব্যবহার। প্রধানত সেই সময় থেকে সোনার সঙ্গে রুপো, প্লাটিনাম, স্টিল বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে এবং নকশার দিকেও বেশি নজর দেওয়া শুরু হয়।

উনিশ শতক থেকে প্রেসাস মেটালের পরিবর্তে কৃত্রিম উপাদান দিয়ে তৈরি গয়না, যা আমরা কস্টিউম জুয়েলারি হিসেবে এখন চিনি, তার প্রচলন হয়। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এ ধরনের গয়না খুবই জনপ্রিয়তা পায়।

গয়নার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শুধু উচ্চবিত্ত লোকজনই সোনা-রুপা-সহ দামি রত্ন ব্যবহার করে আসছে। নিম্নবিত্তের লোকজন তামা, পিতল, কাচ, মাটি ইত্যাদি উপাদানের গয়না ব্যবহার করে। সুতরাং গয়নার সঙ্গে এই শ্রেণীবিভেদ ভীষণভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে কম দামি উপাদানের তৈরি গয়না এখন সমানভাবে জনপ্রিয় ও সমাদৃত। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে। বিকল্প হিসেবে রুপা ও অন্যান্য ধাতুর ওপর গোল্ড প্লেটিং করে সোনার কারিগর দিয়ে সুনিপুণভাবে গয়না তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া কিছুদিন আগেও সবাই সোনাকে অ্যাসেট হিসেবে চিন্তা করত। এখন সে চিন্তাধারাতেও পরিবর্তন এসেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতারা শুধু গয়না নয়, পোশাক ও অন্য ব্যবহার সামগ্রীতেও নতুনভাবে চিন্তা করছে। গয়নাগুলো পরে সঞ্চয়ের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রধানত, আজকের ব্যাংকের মতো এবং যে সমস্ত মহিলারা প্রয়োজনের সময় এটি বিক্রি করতে পারে তাদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে।

কলকাতার গয়না শিল্পের প্রাণকেন্দ্র বউবাজার। মুম্বইয়ের জাভেরি বাজারের অবস্থাও একই। বাবু কালচারের কলকাতায় নানা অনুষ্ঠানে, পুজোতে বাবুর গিন্নিদের জন্য ভারী ভারী গয়না বানাতেন বউবাজারের অলংকার শিল্পীরা। সে সময় একটু সম্পন্ন গৃহস্থ মানেই প্রচুর গয়নাগাটি। সেগুলো তাঁরা পরতেন, জমাতেন, বাক্স খুলে খুলে দেখতেন। অন্দরমহলে এই গয়নাগুলোই

ছিল তাঁদের প্রাণ। মরেও তাঁদের গয়নার বাসনা যে যেত না,তা রবিঠাকুর 'মণিহার' গল্পে দারুণ দেখিয়েছেন। তাঁর বাড়ির বউরাও প্রচুর গয়না পরতেন। প্রসন্নময়ী দেবীর স্মৃতিকথায় তাঁর গয়নার যা বিবরণ পাই, তা শুনলে আজকালকার মেয়েদের হিংসে হবেই। অনেক গয়নার নামও আজকাল শোনা যায় না। গোড়ে, ছালনা, পিন খাড়ু, চাউদানি এয়ারিন, দমদম গোখরি বা ঝাঁপা যে কীরকম গয়না ছিল, তা বিস্তারিত গবেষণার দাবি রাখে। কিন্তু এইসব পরে প্রসন্নময়ীকে ঘুরতে হতো, আর সে জন্য তিনি বিন্দুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না। বিরক্ত হয়ে লিখেছেন, 'সারাদিন এই ছয়-সাত সের ওজনের গহনা পরিয়া চলাফেরা করিতে হইত।'

ধীরে ধীরে শুধু সাজসজ্জা থেকে গয়না স্ত্রী-ধনে পরিণত হয়। বিপদে পড়লে 'এই গহনাই আমাকে রক্ষা করিবে' এই ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, যা থেকে আজও অনেকে রেহাই পায়নি। স্ত্রী ধন এখন আইনে পরিণত হয়, ১৯৮৩ সালে তার পরিমার্জনও হয়।

ঠাকুমারা নাকের মাঝের সেপ্টামে একটা অদ্ভুত গয়না পরতেন। দুই দিক চাপা বোতামের মতো। নাম নাকঠাসা। কেন পরতেন? জবাব পেয়েছিলাম স্ত্রীর নিঃশ্বাস স্বামীর গায়ে সরাসরি পড়া নাকি অশুভ। সোনা শুদ্ধ জিনিস। নাকের অশুভ বাতাস পিউরিফায়েড হয়ে স্বামীর গায়ে পড়ত। ভেবে বেজায় হাসি পেয়েছিল। কিন্তু আজ জেনেছি, এককালে পূর্ববঙ্গে সত্যি সত্যি নাকঠাসা এই কারণেই পরা হতো। মেয়েদের মাথায় ফুল আর ফুলের মালার ব্যবহার ছিল, আজও আছে। সিঁথিতেও অনেকে ফুল পরতেন। খুব সম্ভব অতীতের টায়ার রাজ্য থেকে টায়রা বাঙ্গালি হিন্দু সমাজে এসেছে।

দিন পালটাতে লাগল। মেয়েরা মাথার অলংকার হিসেবে পরতে লাগলেন চৌঙ্ক, শিষফুল, ছোটি ও মৌলি। কপালে পরতেন দমনি, কুটবি, তাওয়াইট, চাঁদটিকা, ঝুমর, গুছই, বারোয়াট আর বিন্দলি। এই বিন্দলিই পরে বিন্দি নাম নিয়েছে। বাঙ্গালিদের মধ্যে বীরবৌলি আর মদনকড়ি নামে দুটি কানের গয়না সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল।

নাকের গয়নার মধ্যে বেশ কয়েকটা ডিজাইন বেশ চলত। তাই মেয়েরা বাপের বাড়ি এলেই পুরোনো গয়না ভেঙে নতুন ডিজাইন বানাতেন। স্বর্ণকার বাড়ি আসতেন গয়নার ডিজাইন নিয়ে। কী অদ্ভুত সব ডিজাইন, কী দারুণ তাঁদের নাম— মাক্কি কেশর, ডালবোলাক, চানবোলাক, হীরাকাট বোলাক। নাকছাবিরও কত কায়দা--- ডালিমফুল, লবঙ্গ, বড়োইফুল, চালতাফুল, দামালকাট— মানে নকশা অনুযায়ী আর কী।

গলার হারে মুক্তার মালার চল সবচেয়ে প্রাচীন। বৈদিক যুগের। তবে ঊনবিংশ শতকে চম্পাকলি, হাঁসুলি, ইতরাবদন, গুলবন্ধ, কান্দি, মোহরণ, হাউলদিল নামে নানারকম গলার হার পরতেন মেয়েরা। জানি না এদের ক'টা এখনও প্রচলিত। মেয়েরাই ভালো বলতে পারবেন।

হাতের গয়নার বেশ কটার নাম জানা আছে। এগুলো তখনও ছিল। আজও কটা টিকে আছে। বাজুবন্ধ (বললেই গান মনে পড়ে 'বাজুবন্ধ খুল খুল যায়'), তাবিজ, অনন্ত, বাউটি, মানতাসা আর রতনচূড়। মানতাসা হলো অনেকটা রিসলেটের মতো। কিন্তু এই গয়না বেশ ভারি ও চওড়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এগুলো কনের মায়ের, দিদিমার বা ঠাকুমার লকারে তোলা থাকে। কারণ বেশ পুরনো দিনের গয়না, এটি পরা হয় কবজিতে। এটি চওড়া ও চৌকো আকৃতির হয় এবং সঙ্গে চেন লাগানো থাকে। রতনচূড় হাতের উপরভাগ অর্থাৎ তালুর উলটো দিকে পরা হয়। কবজির কাছে এটি চুড়ির মতো আটকানো থাকে এবং বাকি অংশ ছড়িয়ে হাতের আঙুলের সঙ্গে লাগানো থাকে। কেউ কেউ এটি সোনার পরেন তবে এটি অনেকটাই ছড়ানো হয় এবং দু'হাতে পরা হয় বলে অনেকটা সোনা লাগে। রতনচূড়কে আজকাল হাতপদ্ম বলে। তবে ভাওটা, জসমবাঁক, কুলুপিয়ার নাম এ যুগের মেয়েরা কেউ শুনেছেন কিনা জানা নেই।

আংটির কথা না বললে চলে না। শকুন্তলার আমল থেকে আংটি চলেছে। আরশি আর ছল্লা নামে দুই রকম আংটি ছিল, বড়ো আকারের যা তর্জনীতে পরতে হতো। আঙুল তুলে কথা বলতে সুবিধে হতো বোধহয়। কোমরে পরার জন্য ছিল পাহজেব, বঞ্জর, জিঞ্জির। যাদের পয়সাকড়ি কম তাঁরা বউদের কোমরে পরার জন্য কিনে দিতেন গোটাহার, আর মিনফল।

এই সময় গয়না পরে বউকে কেমন লাগত? তারও আখ্যান আছে। লিখেছেন বেগম রোকেয়া। এক সালংকারা বধূর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। মেয়েটি যথারীতি নাবালিকা, 'তাঁর মাথায় সিঁথির অলঙ্কার ৪০ ভরি, কর্ণে ২৫ ভরি, কণ্ঠে ১২০ তোলা, সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের, কটি দেশে ৬৫ ভরি, চরণযুগলে ২৪০ ভরি স্বর্ণের বোঝা।'

কলকাতায় বেশ কিছু প্রসিদ্ধ অলংকারের শোরুম রয়েছে যা রাজ্যের অর্থনীতিকে ঊর্ধ্বমুখী করার ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছে। আদিকাল থেকে আমাদের এখানে জুয়েলারি ব্যবসা চলে আসছে। জুয়েলারি বা স্বর্ণ ব্যবসা লাভজনক হলেও এতদিন এটিকে ছোটো ব্যবসা হিসেবে মনে করা হয়েছে। আমাদের এখানে অলংকারের প্রতি নারীর সহজাত আকর্ষণ প্রাচীনকাল থেকেই। বাঙ্গলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সঙ্গে স্বর্ণালংকারের নানা বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই স্বর্ণের গহনা মানুষের কাছে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এটা অনেকের আভিজাত্যের, মর্যাদার অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে ধনী-গরিব সব শ্রেণীর মানুষ কমবেশি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সোনার অলংকার ব্যবহার করে। অনেকে ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ হিসেবে যতটা সম্ভব সোনার গয়না নিজের কাছে রাখতে চান। ভারত-সহ এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সোনার অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, স্বর্ণ অলংকার মানে জুয়েলারি শিল্পে ভ্যালু অ্যাডিশন অর্থাৎ মূল্য সংযোজন অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। হাতে তৈরি সোনার গয়নার প্রায় ৮০ শতাংশ বাংলাদেশ ও ভারতে প্রস্তুত হয়। ভারত বিদেশে সোনার অলংকার রপ্তানির মাধ্যমে বেশ ভালো পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। □

স্বাধীনতা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের নাটক ‘আগুন পাখি’

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা ছিল বাঙ্গালিদের। ১৭৭১ সালে নিরপরাধ দেড়শো জন সন্ন্যাসীকে হত্যা করায় বাঙ্গলার সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যার ফলশ্রুতি সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। নাটোর-রংপুর -সহ পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে সন্ন্যাসীরা সংগঠিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। আনুমানিক ১৭৭৩ সালের এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকা নিয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮১ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশ করেন ‘আনন্দমঠ’ এবং ১৮৮৪ সালে প্রকাশ করেন ‘দেবী চৌধুরানী’ নামে আরও এক উপন্যাস। আবার ওই একই সময়ে ১৭৯৯ সালে চুয়াড় এবং ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এই সময়েই কলকাতার শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ বিরোধিতার আগুন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কংগ্রেস দলের অনেকেই যোগ দিচ্ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামে। এঁদের অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল। উনিশ শতকের একদম সূচনায় বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আবির্ভাবে এই শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের অনুশীলন সমিতির আখড়াগুলি সক্রিয় হয় এই সময়েই।

অতএব বাঙ্গালির বিপ্লবকে প্রশমিত করতে চতুর ব্রিটিশের পরিকল্পনা বঙ্গভঙ্গ। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির এই সময়কে কেন্দ্র করে ‘নয়াবাদ তিতাস’-এর প্রযোজনা ‘আগুন পাখি’, সম্প্রতি অভিনীত হলো কলকাতার মিনার্ভা প্রেক্ষাগৃহে। মাত্র পঞ্চান্ন মিনিটের টান টান উত্তেজনায় নাটকটি আবর্তিত হয়েছে সরস্বতী বাঈ নামে এক বাইজীকে কেন্দ্র করে। ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক বীরাঙ্গনার অদম্য সাহস ও বুদ্ধিমত্তা এই নাটকের উপজীব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিকে পরাহত করতে চতুর ইংরেজ কীভাবে ঢাকার ইসরাত মঞ্জিলে নবাব খাজা সলিমুল্লাহকে মুসলমানদের পৃথক করার ষড়যন্ত্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিভাজন ঘটিয়েছিল, উঠে এসেছে সেই সত্য ইতিহাসও।

বাংলা নাটকের যদি দু’তিন দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তবে মোটামুটি বিষয়বস্তু এই রকম— বিপ্লবের জয়গান করা, যেখানে নাটক শেষ হবে লাল পতাকার তলে এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সংগীতে; নয়তো হিন্দু বা সনাতনী সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞায়— যেখানে রামায়ণ, মহাভারতের মতো ও আদর্শ চরিত্রগুলিকে কলুষিত করা, সত্য ইতিহাস লুকিয়ে জোর করে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর কল্পিত কুসুম সংস্কৃতির অবতারণা।

২০২১ সালে হাওড়া ব্রাত্যজন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবননির্ভর একটি নাটক পরিবেশনা করে এই মিথ ভাঙবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকাশ্যে নাটকটির মাত্র একটি মঞ্চায়ন হয়। স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলিম লিগ নেতৃত্বের কী কলঙ্কময় ভূমিকা ছিল ‘আগুন পাখি’ নাটকটি তা চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার শক্তি দেখিয়েছে। নাটক হিন্দুত্ববাদী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু স্বাধীনতার ইতিহাসে সত্যকথনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, নাট্যকার আবির সেই দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

নাটকের মূল চরিত্র শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের সরস্বতী বাঈয়ের চরিত্রে অভিনয়। একটু যাত্রার ঢঙে হলেও পরিষ্কার ও দৃঢ় সংলাপ নাটকের প্রতিটি উত্তেজক মুহূর্ত তৈরিতে সাহায্য করেছে। নাটক ও নির্দেশনা এবং পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় আবির প্রশংসার দাবি রাখে। সন্দীপ দে’র আবহ এবং বাবলু সরকারের আলোক সম্পাত দক্ষতার সঙ্গে নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত তৈরি করতে সাহায্য করেছে। অনল চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের যথাযথ অভিনয় বাংলা নাটকের খরায় নবজোয়ার আনবে, একথা হলফ করে বলা যায়। □

সাফল্যের মোহে নিজের শেকড় ভোলেননি সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাফল্য কখনও একজনের হয় না। একজনের সাফল্যের পিছনে থাকে অনেকের অবদান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরাই এগিয়ে আসেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। কিন্তু ক'জন মনে রাখেন এইসব শুভানুধ্যায়ীকে? সাফল্যের মোহে অন্ধ হয়ে তারা ভুলে যান সিঁড়ি দিয়ে ওঠার দিনগুলো খুব সহজ ছিল না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যেমন মহারাষ্ট্রের ওয়াসিমের সুনীল কাচকড়। কোনও ইনস্টিটিউটের দ্বারস্থ না হয়েই তিনি চতুর্থবারের চেষ্টায় পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর পদে যোগ দেওয়ার পরীক্ষায় (এমপিএসসি) প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

সুনীল বলেন, 'মেরিট লিস্টে আমার নাম সবার ওপরে দেখে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। বাড়িতে আমরা সবাই পরস্পরকে জড়িয়ে আদর করছিলাম সবাই কাঁদছিল। কেউ আশা করিনি আমি প্রথম হব।'

সুনীলের গ্রাম মহারাষ্ট্রের ওয়াসিমের রঞ্জিতনগরে। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয় সুনীল ছোটোবেলা থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। বাবা-মা দিনমজুর। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন সন্তানদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। সুনীল বলেন, 'বিদর্ভ অঞ্চলে আমাদের পাঁচ একর জমি আছে কিন্তু শুকনো জমি। অনেক বছর আমরা চাষ করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার বাবা-মা চাইতেন আমি যেন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুরণের চেষ্টা করি। তার জন্য তারা দিনমজুরি ছাড়াও রাস্তা তৈরির কাজে যোগ দিয়েছিলেন। বাবা-মা পাশে না দাঁড়ালে আমার স্বপ্ন কোনওদিন পূরণ হতো না।

আসলে পারিবারিক বন্ধন বলতে আমরা ভারতীয়রা যা বুঝি সুনীলদের পরিবার অক্ষরে অক্ষরে সেরকম। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য ভাবে। একজনের সমস্যা অন্যজন নিজের বলে কাছে টেনে নেয়। স্নাতক স্তরের পড়াশোনার সময় সুনীল নিজেও ছোটোখাটো চাকরি করতেন সংসারে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু সাব ইনস্পেক্টরের পদে যোগ দেওয়ার পরীক্ষায় বসার জন্য সুনীল যখন থেকে শম্ভাজীনগরে থাকতে শুরু করলেন তখন তাঁর মাসিক খরচ দাঁড়াল ৩০০০-৫০০০ টাকা। এই টাকা যাতে সঠিক সময়ে সুনীলের কাছে পৌঁছয় তার জন্য ওর বাবা-মা রাস্তা তৈরির শ্রমিকের কাজ নিয়েছিলেন। বন্ধুরা মাসে মাসে ১০০০ টাকা করে দিত। সুনীলের ছোটো ভাইও দাদাকে সাহায্য করার জন্য চাকরি নিয়েছিলেন।

২০২০ সালে ঊর্মিলার সঙ্গে সুনীলের বিয়ে হয়। ঊর্মিলা

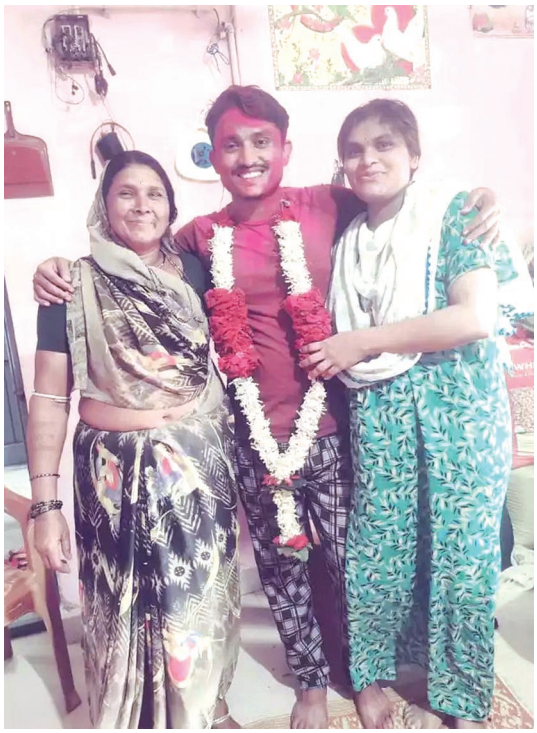

মা ও স্ত্রীর সঙ্গে সুনীল

ওসমানাবাদের কনস্টেবল। সুনীল বলেন, 'কোভিডের জন্য পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল। সেইসময় ঊর্মিলার রোজগার ছিল আমাদের পরিবারের একটা বড়ো ভরসা। তা সত্ত্বেও আমি যে পরীক্ষা দিতে পেরেছি তার জন্য ঊর্মিলার অবদানও কম নয়।' ঊর্মিলাও বলেন, 'আমি সুনীলকে নিয়ে গর্বিত। পরিশ্রম করলে যে ফল পাওয়া যায় ও হচ্ছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।'

সুনীল কাচকড়ের এই কাহিনি কোনও একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাফল্যের কাহিনি নয়। এখানেই এর বিশেষত্ব। ভারতবর্ষ চিরকাল পরিবার ও পারিবারিক বন্ধনের কথা বলে এসেছে। পরিবার যখন কোনও সদস্যকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেয় তখন তার সিদ্ধিলাভ অনিবার্য। অথচ এখন যৌথ পরিবার ভেঙে ছোটো পরিবারে থাকার মোহ অনেকেরই। মাথার ওপর ছাদ আর চার দেওয়াল নিরাপত্তা হয়তো দেয় কিন্তু ব্যক্তির হতাশা আর একাকিত্বকে দূর করতে পারে কি? যে কথা ভাই বা বোনকে কিংবা বাবা-মাকে বলা যায়, স্ত্রী যতই আপন হোন সেই কথা ঠিক ওইভাবে তাকে বলা যায় না। অথবা হতাশার মুহূর্তে বাবার হাত একবার কাঁধে এসে পড়লেও অন্ধকার অনেকটা কেটে যায়।

আশা করা যায় আগামী পৃথিবী আবার যৌথ পরিবারের কথা ভাববে। নয়তো শুধু পরিবারই ভাঙবে না, ঘরও ভাঙবে। □

দাদু ও নাতি

অসম বন্ধুত্বের উদাহরণ হলো দাদু-নাতি। বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও নির্মল বন্ধুত্ব। মনে যখন যা প্রশ্ন আসে নির্দ্বিধায় জানতে চায় নাতি। আর দাদু মন উজার করে ঢেলে দেন তাঁর ছোট্টো বন্ধুকে। আজ নবাঙ্কুরের বন্ধুদের জন্য এরকম এক দাদু-নাতির কথোপকথন।

—আচ্ছা দাদু, জ্ঞানী কাকে বলে?

—জ্ঞান থেকে জ্ঞানী শব্দটি এসেছে। যার জ্ঞান আছে তাকেই জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো নলেজ। যার অর্থ হলো জানা। কোনো বিষয় সম্পর্কে যখন আমাদের মনে সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল ধারণার জন্ম নেয়, তখন তাকে আমরা জ্ঞান বলি।

—জ্ঞানী হতে গেলে কি ডিগ্রি অর্জন বা বড়ো বড়ো নামি দামি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট অর্জন খুব জরুরি?

—না না, তা নয়। জ্ঞানী হতে গেলে ডিগ্রি অর্জন বা বড়ো বড়ো নামি দামি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট অর্জন খুব জরুরি নয়। কারণ জ্ঞানকে সাধনা, শিক্ষা, গবেষণা, জিজ্ঞাসা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা যায়। কিছু কিছু মানুষ বা মহাপুরুষের জ্ঞান স্বর্গীয় বা ভগবান প্রদত্ত হয়ে থাকে। যেমন প্রাচীনকালের সংস্কৃত ভাষার মহাকবি কালিদাস, আধুনিককালের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহাকবি কালিদাস প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন। সেই মূর্খ কালিদাসই পরবর্তীকালে 'মহাকবি কালিদাস' নামে পরিচিতি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথাগত শিক্ষা বা কোনো ডিগ্রি লাভ করেননি। অথচ সারা বিশ্বের মানুষ তাঁকে বিশ্বকবি নামে অভিহিত করেছেন। দেশ বিদেশে বহু সম্মান পেয়েছেন।

—জ্ঞানী আর শিক্ষিতের মধ্যে কী পার্থক্য দাদু?

—অন্যকে জানেন শিক্ষিত আর নিজেকে জানেন জ্ঞানী। লেখাপড়া করে অনেক সার্টিফিকেট জোগাড় করলেই কেউ জ্ঞানী হতে পারে না। একজন্য বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে জানতে হয়। পুঁথিগত বিদ্যা আমাদের বাক্সবন্দি করে রাখে। নিজেকে সমাজে মেলে ধরা, সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসা প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ। বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষের মনেই আত্মকেন্দ্রিকতা, দম্ভ, অহংকার পূর্ণমাত্রায় থাকে। অন্যদিকে জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো অহংকার বা দম্ভ প্রকাশ করেন না। তাঁদের মনে তা স্থানও পায় না। জ্ঞানী ব্যক্তির চরিত্রে থাকে বিনয়, নম্রতা। তাঁরা সবার সঙ্গে ভদ্র আচরণ করেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, একটি সমাজের জন্য, জাতির জন্য শিক্ষিত মানুষ যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক বেশি প্রয়োজন। কারণ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ধূর্ত, চালাক বা বুদ্ধিমান হন তবে তিনি শুধু তার প্রয়োগ ঘটান নিজের বা পরিবারের জন্য। আর জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধিমান হলেও তার অপপ্রয়োগ করেন না। তিনি তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগ করেন সমাজের মঙ্গলের জন্য। তোতাপাখির মতো কেবল বুলি আউড়িয়ে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট অর্জনকারী একজন শিক্ষিত লোকের দেশ, জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা বা চিন্তাভাবনা থাকে না। নিজের বা পরিবারের স্বার্থসিদ্ধি হলেই হলো। দেশ, জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি গোল্লায় যাক, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি দেশ, জাতি, সমাজ, সংস্কৃতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কাজে লাগান।

--- দাদু, আজকাল দেশে ডিগ্রি, সার্টিফিকেট, শিক্ষিত শব্দগুলি নিয়ে যে বড়ো বড়ো কথা চলছে সে সম্পর্কে তুমি কী বলবে?

—যারা আজকাল দেশে ডিগ্রি, সার্টিফিকেট এই কথাগুলি নিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাদের জন্য শুধু ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের এই কথাটি যথেষ্ট — **মেধাবী হয়ে গর্ব করার কিছুই নেই। শয়তানও কিন্তু মেধাবী হয়। মনুষ্যত্ব ও সততা না থাকলে সে মেধা ঘৃণিত।**

দাদুভাই, শেষে আমি তোমাকে এই কথাটি বলতে চাই যে, সকল ডিগ্রিধারী ব্যক্তিই কিন্তু অহংকারী বা দাম্ভিক নয়। অনেক শিক্ষিত লোক আছেন যারা বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র। তারা দেশের মানুষের উন্নতি ও বিকাশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন। তাদের কাছে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ।

রসময় সরকার

বীর বনবাসী

ঠাকুর রণমত সিংহ

মধ্যপ্রদেশের সতনা নিবাসী ঠাকুর রণমত সিংহের জন্ম ১৮২৫ সালে। তাঁর বাবার নাম মহীপত সিংহ। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চলে এই স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। এক সময় ছলনা করে ইংরেজরা তাঁকে বন্দি করে এবং ১৮৫৯ সালে আগ্রা জেলে তার ফাঁসি হয়। তিনি বাল্যকাল থেকেই স্বাধীনচেতা ও স্বাভিমানী প্রকৃতির ছিলেন।

তাঁর স্মরণে মধ্যপ্রদেশে রেওয়া জেলায় গভর্নমেন্ট ঠাকুর রণমত সিংহ কলেজ ও স্টেডিয়াম রয়েছে। তাঁর স্মরণে মধ্যপ্রদেশের বর্তমান সরকার এক বিশাল মূর্তি স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন।

জানো কি?

● পাকিস্তানে দুটি শক্তিপীঠ রয়েছে। (১) বালুচিস্তানে দেবী হিংলাজ, (২) করাচির করবীপুরে দেবী মহিষমর্দিনী।

● বাংলাদেশে ৬ শক্তিপীঠ। (১) বরিশালে দেবী সুগন্ধা, (২) চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দেবী ভবানী, (৩) শ্রীহট্টে দেবী জয়ন্তী। (৪) শ্রীহট্টে দেবী মহালক্ষ্মী। (৫) বগুড়ায় দেবী অপর্ণা এবং (৬) যশোরে দেবী যশোরেশ্বরী।

● তিব্বতে ১টি, দেবী দাক্ষায়ণী। ● নেপালে ৩টি, দেবী মহাশিরা, দেবী গন্ধকী চণ্ডী, দেবী উমা। ● শ্রীলঙ্কার জাফনায় ১টি, দেবী ইন্দ্রাক্ষী।

ভালো কথা

চিলের ছানা

আমাদের বাড়ির নারকোল গাছে অনেকদিন থেকেই দুটি চিল থাকে। বছরে একবার করে দুটো ছানা হয়। ওরা উড়তে শিখে কোথাও চলে যায়। গত মাসেও দুটো ছানা হয়েছিল। একদিন পালক ঝাপটানোর সময় দুটোই গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। বাবা কুড়িয়ে নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে বারান্দায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। ওদের মা-বাবা ওখানেই খাবার খাওয়াত। বাবাও মাঝে মাঝে নেংটি ইঁদুর ওদের খাইয়ে দিত। ওরা মোটেও ভয় করত না। দূর থেকে ওদের মা-বাবা দেখত। এখন ছানাদুটো উড়তে শিখেছে। এখন আর ঝুড়িতে থাকে না। ওদের মা-বাবার সঙ্গে নারকোল গাছেই থাকে। কিন্তু বাবা নেংটি ইঁদুর নিয়ে গাছের নীচে দাঁড়াতেই ওরা বাবার কাঁধে বসেই খাবারটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে আবার গাছে উড়ে গিয়ে বসে। আমি খাবার নিয়ে দাঁড়ালে ওরা আমার হাত থেকে খায় না। ওরা শুধু বাবাকেই চেনে।

সুদেষ্ণা মহান্তি , নবম শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আঢাকা খাবার

ঐন্দ্রি মহান্ত, দ্বিতীয়শ্রেণী, নুড়াইপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম।

আঢাকা সব খাবার দেখেই
মাছি উড়ে আসে
তাদের পা ও গায়ের ময়লা
ছড়ায় আশেপাশে।
খাবার খেলে সেই জীবাণু
দেহে ছড়িয়ে পড়ে
পেটের রোগে ভোগে মানুষ
কিংবা ভোগে জ্বরে।
পোকামাকড় থেকে বাঁচতে
বলি এবার থেকে
খাবার খেতে দেরি হলে
রাখবে সেটা ঢেকে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

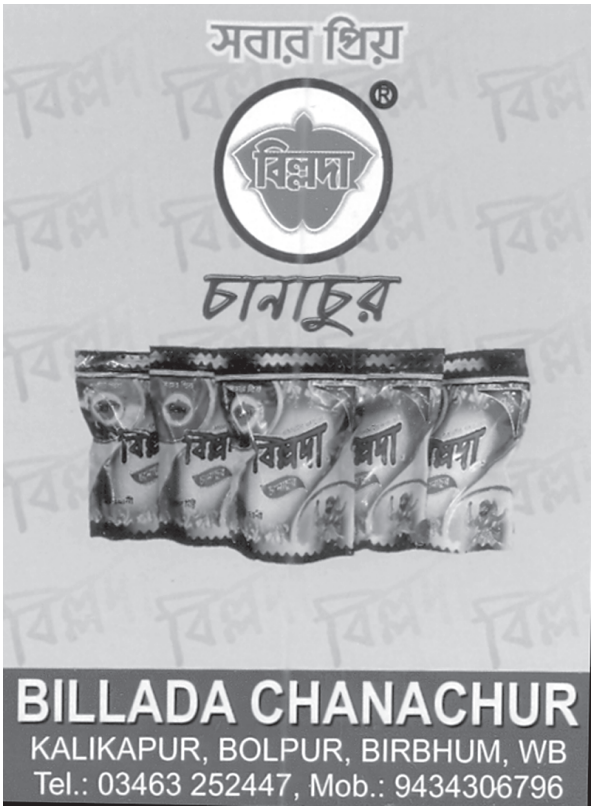

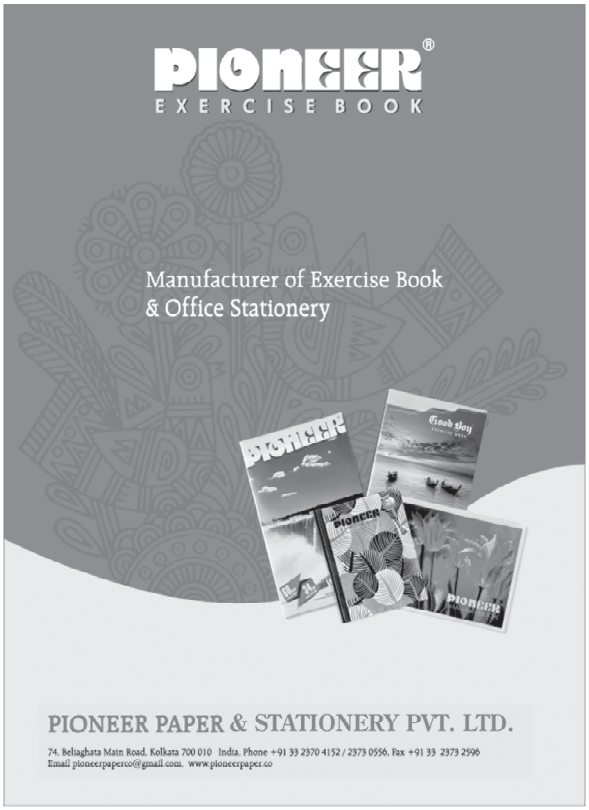

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

দেশের নামের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়

তরুণ কুমার পণ্ডিত

মোদী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাঙ্গালুরুতে একসঙ্গে মিলিত হয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীর বিরুদ্ধে একজোটে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরোধিতা সত্ত্বেও জোটের নামকরণ করা হয়েছে আই.এন.ডি.আই.এ।

দেশের নামে বিরোধী জোটের 'ইন্ডিয়া' নামকরণ নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখার্জি ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে বিরোধী জোটের এইরকম নামকরণ সম্পূর্ণ উসকানিমূলক। অনেকেই প্রণব কন্যার এই নির্ভীক মন্তব্যকে যথার্থ, প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিপূর্ণ বলে মনে করেছেন। কোনও দল বা ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু থেকে অবশ্যই কোনও দেশের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। যে কোনো রাজনৈতিক সত্তাকে আক্ষরিকভাবে জাতির সঙ্গে সমর্থক করে তোলা উচিত নয়। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা ও ভূমিকা দেশকে নিশ্চয়ই অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু দেশের ২৬টি বিরোধী দল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালাইন্স (ইন্ডিয়া) নাম দিয়ে অযৌক্তিকভাবে জোটের নামকরণ করল যা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। বিরোধীদের মস্তিষ্কপ্রসূত দেশের নামের সঙ্গে জুড়ে এই নামকরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অশনিসংকেত।

এমনিতেই স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের সংবিধানে একটি দেশের দুটি নাম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত অর্থাৎ ইন্ডিয়া নামটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হলো। এতকাল যে দেশটি ভারত নামেই পরিচিত ছিল, কিছু ইংরেজভক্ত প্রথম সুযোগ পেয়েই সেই নাম পরিবর্তন করে দিলেন। এটা শুধু নামের পরিবর্তন নয়, চিন্তন ও মননেরও পরিবর্তন--- যা এই দেশের পরম্পরা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; ইংরেজদের হাত থেকে এদেশের স্বাধীনতা লাভের যে সংগ্রাম তা ছিল মূলত ভারতবাসীর—ইন্ডিয়ানদের নয়। ইন্ডিয়ানরা ইংরেজদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর নিয়েই চিন্তিত ছিলেন, আর ভারতীয়রা চাইছিল যাবতীয় বিদেশিয়ানার অবসান— ভারতের পরম্পরা ও ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কাকতালীয়ভাবে দেশের বিরোধী দলগুলোর জোটের দেওয়া ইন্ডিয়া নামের সঙ্গে যেন এই ইন্ডিয়ানদের কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই ইন্ডিয়ানরা ইংরেজদের কাছ থেকে যে হীনম্মন্যতা শিক্ষা পেয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই বললেন— জাতীয়তাবাদ জিনিসটা ইংরেজরাই আমাদের শিখিয়েছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে সামগ্রিক স্বাভিমান শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ বা লক্ষ্য কোনও ভাবেই গৃহীত হয়নি। ফলে স্বাভিমান ও মূল্যবোধের যে শিক্ষা হাজার হাজার বছর ধরে এদেশের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল, প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার নামে তাকে হত্যা করা হলো। যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী বলেছিলেন, তার ধারে কাছে দিয়ে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা গেল না। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভোগের যে শিক্ষা তার পরিবর্তে কেবলমাত্র ভোগসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হলো। তাই তো আজকে যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এই ইন্ডিয়া নামক বিরোধী জোট তাঁর রাজত্বে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা জেলের মধ্যে চলে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে মানুষ তৈরির শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তার পরিবর্তেইনফরমেশন ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইন্ডিয়ানরা দেশের পরিচালক হলেন। দেশের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে কোনও ধারণাই থাকলো না। কীভাবে ভারতবাসী এত বছর ধরে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করে এই সমাজ, এই সংস্কৃতি ও এই ধর্ম রক্ষা করেছিল তা ইন্ডিয়ানরা জানলো না। কেবলমাত্র ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ৫০ বছরের লড়াইকে তাঁরা জানল, ভারতীয়রা নাকি ইংরেজদের কাছ থেকে জাতীয়তাবোধ শিখেছে। নিজের দেশ সম্পর্কে কী পরিমাণ অজ্ঞ হলে এমন উন্মাদ উক্তি করা যায়, তা ভাবতে অবাক লাগে।

১৯৫০ সালে সংবিধানে এই দেশকে ইন্ডিয়া হিসেবে পরিচয় দেওয়ার আগে এটি কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নামেই পরিচিত ছিল। আর ভারত শব্দের ইংরেজি অনুবাদ ইন্ডিয়া নয়। ইন্ডিয়া ও ভারত একই দেশের দুটো পৃথক মানসিকতা বহন করে। আমরা প্রতিদিন প্রতি সময়েই তাঁর পরিচয় পাচ্ছি। শাসক ইন্ডিয়ানরা কীভাবে ভারতীয়দের উন্নত করবে সেই চিন্তায় দীর্ঘ ৭২ বছর ধরে বিনিদ্র সময় কাটিয়েছেন, যখনই একটু সুযোগ পেয়েছেন, তখনই দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেছেন, দুর্নীতি করেছেন, আর ভারতীয়দের দয়া করেছেন। এঁদের মাথায় ভারতীয় চিন্তা, দর্শন, মনন, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সামান্যই আছে বা নেই। উন্নতি বলতে এঁরা শুধু আর্থিক উন্নতি বোঝেন। ভারতীয় সংবিধানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা যায় ভারত দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া হওয়া উচিত ছিল। দেশের নামের বিকৃতির সঙ্গে কোনো প্রকার আপোশ করা হবে না। মনে রাখতে হবে দেশের উর্ধ্বে কেউ নন। সম্পূর্ণ দেশ ও জাতিকে যারা আজকে ভুল পথে চালাচ্ছে, প্রতিনিয়ত আত্মবিস্মৃত হতে শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। দেশের নামের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়। এর আগের লোকসভা নির্বাচনেও বিরোধীরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারেনি। এবারেও অবশ্যই সেই ধারা বজায় থাকবে। তাহলে কি ইন্ডিয়া হেরে যাবে? এ কেমন দেশবিরোধী কথা! দেশের মধ্যে আর একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা আমাদের দেশকে দুর্বল করবে বইকী। □

ফঃ ৬

জাহাজে তিন সপ্তাহ

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। তিনদিনের জাহাজ সফর। আজকাল কেউ আর জাহাজে বিদেশযাত্রা করে না। সকলেই বিমানে বিদেশ যাত্রা করে থাকে। তখন বিমানে ভ্রমণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। সে যাইহোক, তখন দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট নির্মাণ কাজ চলছিল। আমি শিক্ষানবিশ হিসেবে এক বছর ভিলাই স্টিল প্লান্টে শিক্ষানবিশি শেষ করে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টে কাজে যোগ দিয়েছি। হঠাৎ শুনলাম আমাকে বিদেশযাত্রা করতে হবে। সে সময় দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট থেকে মোটামুটিভাবে ৩৫০ জনকে বিদেশে পাঠানো হচ্ছিল। আমারও একটা সুযোগ জুটে গেল বিদেশ যাত্রার। কয়েকদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল পাশপোর্ট, ভিসা, ইনস্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য। অবশ্য সবই প্রায় স্টিল প্লান্ট কর্তৃপক্ষ করিয়েছিলেন। অতপর নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব-সহ পৌঁছলাম বোম্বাই রওনা দেওয়ার জন্য। কারণ আমাদের জাহাজ ধরতে হবে বোম্বাই থেকেই।

নির্দিষ্ট দিনে হাওড়া থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেনে দু' রাত কাটিয়ে বোম্বাই পৌঁছলাম। তারপর দুদিন খুব ব্যস্ততায় কেটে গেল ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে পাশপোর্ট, ভিসা-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে। বলতে ভুলে গেছি, আমাদের জাহাজে করে ইউকে পাঠানো হচ্ছিল। আর কয়েকজন যাদের কাগজপত্র তৈরি হয়নি তাদের পরের দিন বিমানে করে পাঠানো হয়েছিল। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও নানারকমের ফরম্যালিটিজ অতিক্রম করে জাহাজে ওঠা গেল। নির্দিষ্ট কেবিন খুঁজে নিয়ে নিজেদের বোঁচকাবুঁচকি সব রেখে আবার জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালাম। যাত্রীরা সবাই লটবহর নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে জাহাজে উঠে আসছেন। জাহাজঘাটায় হাজার খানেক পুরুষ ও মহিলা কাচ্চাবাচ্চা-সহ দাঁড়িয়ে। তারা সবাই আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সি-অফ করতে এসেছেন।

এক সময় জাহাজের ভোঁ বাজল। জাহাজেও একটা করুণ সুরের মিউজিক শুরু হলো। জাহাজের যাত্রী এবং জেটিতে দাঁড়ানো আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবরা হাত নাড়াতে শুরু করল। সকলেরই চোখ সজল, অশ্রুপূর্ণ। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? অনেকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কান্না চাপার চেষ্টা করছিলেন। হাত নাড়ার তো বিরাম নেই। আমাদের তো ওসব বালাই নেই। আমরা তো ওসব হাওড়া স্টেশনেই সেরে এসেছি। তবুও আমাদের চোখও কেমন যেন সজল হয়ে উঠলো। আশেপাশে একটু আধটু ফোঁপানির শব্দও কানে আসছিল।

এদিকে জেটির সঙ্গে জাহাজের ব্যবধান একটু একটু করে বাড়ছিল। হাত নাড়ার কমতি নেই কিছু। শেষ পর্যন্ত তীরভূমি অস্পষ্ট হয়ে গেলে আমরা কেবিনে ফিরে এলাম। চারজনের কেবিন। অনেকটা ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কুপের মতো। আমরা চারজনই দুর্গাপুরের ট্রেনি। যদিও আগে আলাপ পরিচয় ছিল না। একটু পরে আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। একজন আমারই বয়সি আর দুজন একটু সিনিয়র, অতএব দাদা। জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে আবার গিয়ে ডেকে বসা। ডেকের রেলিং ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। বহু দূরে তীরভূমির আলো মিটমিট করছে। আবার এসে ডেক চেয়ারে বসে পড়লাম। অন্ধকার হয়ে গেছে। জাহাজের আলো ছাড়া চারদিক নিকষ কালো অন্ধকার। জাহাজের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। বেশ কিছুটা দূরে আর একটা জাহাজ যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। জাহাজটাতে

দীপাবলী পালিত হচ্ছে মনে হচ্ছিল এতটা আলোকোজ্জ্বল। কিছুক্ষণ পর ডিনারের ঘণ্টা বাজল। আমরা ডাইনিংরুমে গেলাম। বিরাট হল। মনে হলো শ'দেড়েক লোক একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া সারতে পারবে। ডিনার সেরে আবার ডেকে। ঘণ্টা খানেক সেখানে কাটিয়ে কেবিনে চলে এলাম। কয়েকটা দিন প্রচণ্ড ধকল গেছে। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাদেবী চোখে ভর করলেন।

পরদিন ভোরবেলা কেবিনের দরজায় ঠক ঠক শব্দ। উঠে দরজা খুলে দিলাম। কেবিনবয় বেড টি নিয়ে এসেছে। বেডসাইড টেবিলে রেখে চলে গেল। বেড টি মানে শুধু চা নয়। এক গ্লাস করে ফলের রস— আম, আনারস, কমলা। এক একদিন একের রকম। এছাড়া টোস্ট ও বাটার আর এক টিপট চা। বেড টি সেরে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে কেবিনে এসে যথাযথভাবে নিজেকে আচ্ছাদিত করে ডেকে এলাম। ইতিমধ্যে অনেকেই ডেকে এসে ডেক ভ্রমণ শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের জাহাজের ডেক পুরোটা এক রাউন্ড দিলে এক কিলোমিটার হবে। পাঁচ রাউন্ড দিলে পাঁচ কিলোমিটার। ছোটো জাহাজ বলা চলে। ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

তারপর ডেকচেয়ারে এসে বসে পড়লাম। চারিদিকে জল আর জল। মাঝে মাঝে দু'একটা মাছ-ধরা নৌকা যাচ্ছিল। ভাবছিলাম উপকূল থেকে এতদূরে গভীর সমুদ্রে নৌকাগুলো এল, ফিরতে পারবে তো? তখন জানতাম না আসলে জাহাজটা যাচ্ছিল গুজরাটের উপকূল দিয়ে ১০-১২ কিলোমিটার দূরত্ব রেখে। তবে তটভূমি কিছুই চোখে আসছিল না। জাহাজ চলেছে করাচী বন্দরের উদ্দেশে মুম্বাই থেকে ৭০০ কিলোমিটার দূরত্বে। ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা বাজল। ডাইনিংরুমে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে এসে আবার সেই ডেক। ডেক চেয়ারে বসে শুধু গল্প আর সময় কাটানো। এক সময় উঠে গিয়ে স্নানটা সেরে এলাম। আস্তে আস্তে দু'চার জনের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল। দুর্গাপুর থেকে আমরা প্রায় ২০-২৫ জন যাচ্ছিলাম ইউকে-তে ট্রেনিং নিতে। আমাদের জাহাজের নাম ছিল SS circassia। জাহাজটা খুব একটা বড়ো নয়, ছোটোই বলা যেতে পারে। যাত্রীদের অধিকাংশই ভারতীয় আর ব্রিটিশ। এক সময় লাঞ্চের ঘণ্টা বাজল। আবার ডাইনিং হলে। স্যুপ, ব্রেড, চিকেনরোস্ট, স্যালাড, ডেসার্ট, কফি দিয়ে লাঞ্চ হলো। এবার কী বা কোথায়? কোথায় আবার, সোজা কেবিন। বাঙ্গালি তো একটু দিবানিদ্রা না হলে চলে? বেশিক্ষণ অবশ্য নয়। মাত্র ঘণ্টা দুই। তারপর ফ্রেশ হয়ে আবার ডেক এবং ডেক চেয়ারে বসে সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করা। আরব সাগরের নীল জল। ছোটো ছোটো ঢেউ। মাঝে মাঝে দু'একটা মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে একটু উড়েই আবার জলে পড়ে যাচ্ছে। জানলাম এগুলো উড়ুক্কু মাছ। ওরা অবশ্য পাখির মতো উড়ে বেড়াতে পারে না। বিকেল হতে না হতেই টি-র ঘণ্টা বাজল। আবার ডাইনিং হলে। চা, কেক, পেস্ট্রি দিয়ে চা পর্ব মিটল। আবার সেই ডেক।

এখন আর মাছ ধরার নৌকাগুলো দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ জাহাজ গভীর সমুদ্র দিয়ে চলেছে। দুদিন এভাবে চলার পর জাহাজ এসে নোঙ্গর করলো করাচী বন্দরে। সে সময় করাচী ছিল পাকিস্তানের রাজধানী। জাহাজে ঘোষণা করা হচ্ছিল, যারা করাচী নামতে চান নিজেদের পাশপোর্ট, ভিসা প্রভৃতি নিয়ে নিজ দায়িত্বে শহরে যাবেন আর বেলা দুটোর মধ্যে অবশ্যই জাহাজে ফিরে আসবেন। কয়েকদিন শুধু জল দেখে দেখে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই ডাঙ্গায় নামার জন্য প্রাণটা ছটফট করছিল। কিন্তু পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ। বন্দরে নেমে বেশ ভয় ভয় করছিল 'কী জানি কী হয়', আমরা কুড়ি-পঁচিশ জন বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চললাম একে তাকে প্রশ্ন করতে করতে। শেষে একজনকে প্রশ্ন করাতে তিনি পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন? তাকে বলা হলো আমরা SS Circassia জাহাজের যাত্রী। ইংল্যান্ড যাচ্ছি। জাহাজ করাচী বন্দরে থেমেছে। তাই আমরা শহর দেখতে বেরিয়েছি। ভদ্রলোক কী ভাবলেন জানি না আমাদের সঙ্গ নিলেন।

তারপর পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রপতি ভবন এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললেন। কথায় কথায় জানা গেল তিনি পূর্ববঙ্গের লোক। পূর্বপাকিস্তান হওয়ার পর করাচীতে এসে ডেরা গাড়েন। ব্যবসা করেন। বছরে ছ'মাস থাকেন লন্ডনে। এক মেম সাহেবকে শাদি করেছেন। মেমসাহেব অবশ্য সে সময় লন্ডনে ছিলেন। এক সময় প্রশ্ন করলেন দুপুরে আমরা কোথায় খাব? জাহাজে ফিরতে ফিরতে তো লাঞ্চ টাইম শেষ হয়ে যাবে। তাই বলা হলো 'ফেরার পথে কোনও হোটেলে দুপুরে খেয়ে নেব'। উনি একটু চিন্তা করলেন তারপর বললেন, 'আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার বাড়ি চলুন মুরগির মাংস আর ভাত খেয়ে সোজা জাহাজে চলে যাবেন। আমার বাড়ি কাছেই। আমার সিনিয়র তো হাতে চাঁদ পেলেন। দু'তিন ঘণ্টা হাঁটতে হাঁটতে খিদেও পেয়ে গিয়েছিল খুব। সবাই সম্মতি জানাতে উনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে এনে বসালেন। তারপর কম্বাইন্ড হ্যান্ডকে বললেন বাজার থেকে মুরগি কিনে এনে রান্না করতে। কম্বাইন্ড হ্যান্ড তো সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ছুটল। আধঘণ্টা পরে চিকেন নিয়ে ফিরল। তারপর রান্না বসাল। রান্না হলে খাওয়া দাওয়া।

ইতিমধ্যে সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। বেলা দুটোর মধ্যে জাহাজে ফিরতে না পারলে চিত্তির। এদিকে খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। ভদ্রলোকও বেশ বিব্রত বোধ করছেন। কিন্তু করণীয় কিছু নেই। কিন্তু খেল দেখাল কম্বাইন্ড হ্যান্ড। এক ঘণ্টার মধ্যে সব রেডি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম। ফর্মালিটিজ বলে আর কিছু থাকলো না। খাওয়া হলে মুখ হাত ধুয়ে সোজা রাস্তা। একটা টাঙ্গা ধরে সোজা জাহাজ ঘাট। সম্ভবত দুটো পাঁচ মিনিট বা ১০ মিনিটের মধ্যে জাহাজে উঠে পড়ে হাঁফ ছাড়লাম। কিছুক্ষণ ডেক চেয়ারে বসে বিশ্রাম। পরে কেবিনে ঢুকে দিবানিদ্রা। দিবানিদ্রা সেরে যখন আবার জাহাজের ডেকে এলাম তখন জাহাজ মাঝ সমুদ্রে, করাচী বন্দর আর নজরে আসছে না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো সারাদিনের কর্মকাণ্ড আর করাচীর সঙ্গে কলকাতার তুলনামূলক আলোচনা। সন্ধ্যে নাগাদ ডিনারের ঘণ্টা বাজলে আবার ডাইনিং হলে। ডিনার সেরে আবার ডেকে এসে বসা। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে কেবিনে ফিরে সুখনিদ্রা।

এখন আমাদের জীবন একটা নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী চলছে। ভোরবেলা কেবিন বয়ের বেডটি-সহ আগমন। বেডটি সেরে নিত্যকর্ম সমাপন। তারপর ধোপদুরস্ত হয়ে উপরে গিয়ে ডেক ভ্রমণ। দুতিনটি পাক দিয়ে ডেকে চেয়ারে বসে বিশ্রাম এবং সমুদ্র শোভা নিরীক্ষণ। সুবিধে মতো এক সময় স্নান করে নেওয়া। কাজকর্ম কিছু নেই। লাঞ্চটাইমে লাঞ্চ, বিকেলে টি-টাইমে টি, আবার সন্ধ্যের পর ডিনারের সময় ডিনার। বাকি সময়টা ডেকচেয়ার। ডিনারের পর অনেকে লাউঞ্জ বা স্মোকিং রুমে গিয়ে বসেন। সেখানে তাস, দাবা প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। লাইব্রেরি আছে, সেখানে গিয়েও অনেকে বসেন।

এবার জাহাজ চলেছে আরব সাগর দিয়ে এডেন বন্দরের দিকে। দূরত্ব ২১০০ কিলোমিটার মোটামুটিভাবে। জাহাজ চলছে তো চলছেই। চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছু নেই। 'জল শুধু জল দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল'।

মাঝে মধ্যে একটা জাহাজ। সেটাই আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি। মাঝে মাঝে দেখছি সমুদ্রে জলের মধ্যে থেকে কে যেন পিচকিরির মতো জল ছুঁড়ে দিচ্ছে ওপরের দিকে। পরে জানলাম ওগুলো তিমি। মাঝে মাঝেই এ রকম দেখা যাচ্ছে। বোঝা গেল এ জায়গাটায় অনেক তিমি রয়েছে।

ইতিমধ্যে আমাদের অনেকের বমি হচ্ছে বা গা বমি বমি করছে। খাওয়ার রুচি চলে গেছে। জানা গেল এটা সি-সিক্‌নেস। সমুদ্র উত্তাল ছিল না। থাকলে আক্রান্ত হতে হতো আগেই। রেমেডি কী? উপায় পরিশ্রম করা। সত্যিই তো পরিশ্রম একদম হচ্ছে না। ডেকে কয়েকবার পাক দেওয়া ছাড়া। জানার পর ডেকে পাক দেওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। যে কোনও কারণেই হোক আমাকে সি সিকনেসে আক্রান্ত হতে হয়নি। খাওয়ার ঘণ্টা বাজলেই আতঙ্ক হতো। তবে ডাইনিং হলে না গেলে কে আর কার খোঁজ নিচ্ছে ঘনিষ্ঠরা ছাড়া। আমাদের মধ্যে অনেকে তো কেবিন থেকে বেরই হচ্ছে না। ইতিমধ্যে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে যে আলাপ পরিচয় হয়নি তা নয়, তবে তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই শক্ত। কারণ উচ্চারণটা এমনই যে প্রশ্নটা বোঝাই দুঃসাধ্য। তাই সেই 'ইয়েস, নো, ভেরি গুড' দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন পাকিস্তানির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে করাচী থেকে জাহাজে উঠেছে। তার সঙ্গে হিন্দিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। দু'চার দিন পরে অবশ্য সি-সিকনেসের ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠা গেল। আর এদিকে জাহাজ চলছে তো চলছেই। আবহাওয়াটা এখনও পর্যন্ত ভালোই। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন, আমরা চৌধুরীদা বলে ডাকতাম। খাওয়ার টেবিলে বসে মেনুকার্ড দেখে সে স্টুয়ার্ডকে ডেকে চুপি চুপি কী সব অর্ডার দিত।

একদিন আমরা সবাই তাকে চেপে ধরলাম। পরে জানা গেল ষাঁড়ের লেজের স্যুপ বা ষাঁড়ের জিভ ভাজা এইসব তার মেনুর মধ্যে থাকত। আমরা তাকে 'মিঞা সাহেব' বলে ডাকতে শুরু করলাম। সে ছিল বাঙ্গাল। পূর্বপাকিস্তানে মিঞাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু। ইতিমধ্যে কদিন কেটে গেছে খেয়াল নেই। একদিন ভোরবেলা ডেকে এসে দেখি জাহাজ এক বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। পোর্ট এডেন। ঝকঝকে সকাল। জাহাজটা অবশ্য বন্দরের সঙ্গে লাগানো ছিল না। একটু দূরে থেমেছিল। লোকজন নৌকা করে বন্দরে যাওয়া আসা করছিল। বন্দরে নামার জন্য আমরাও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। জল দেখে দেখে তো আমাদের চিত্ত বিকল হয়ে গিয়েছিল। ব্রেকফাস্ট করেই আমরা তৈরি হলাম। বন্দরে নামার অভিজ্ঞতা আমাদের করাচী বন্দরেই হয়েছিল। অতএব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আর কিছু পাউন্ড শিলিং সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকা করে বন্দরে গিয়ে উঠলাম। চেকিঙের পর রাস্তায় উঠে দেখি বড়ো বড়ো সব ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে শহরে যাওয়ার জন্য। আমার ট্যাঁকের জোর না থাকায় আমি যাইনি। বন্দরে রাস্তার ধারেই অজস্র দোকান। হরেক রকম জিনিস। ক্যামেরা, বায়নোকুলার, ট্র্যানজিস্টার, টেপরেকর্ডার, সুন্দর সুন্দর পুতুল, রকমারি গহনা আরও অনেক কিছু। সঙ্গে টাকাপয়সা অল্পই ছিল। তাই আমি একটা জাপানি সিল্কের ড্রেসিংগাউন কিনলাম এক পাউন্ড অর্থাৎ ১৩ টাকা দিয়ে। আমি, অরুণ আর দিলীপ তিনজনেই এদিক সেদিক ঘণ্টা দুই ঘোরাঘুরি করে জাহাজে ফিরে এলাম। তারপর স্নানাহার, দিবানিদ্রা সেরে জাহাজের ডেকে এসে দেখলাম জাহাজ চলতে শুরু করে দিয়েছে। অগাধ জলরাশি একটু পরেই স্থলভাগের চিহ্নমাত্র নেই। জাহাজ এবার রেড সি বা লোহিত সাগর দিয়ে চলবে, গন্তব্য পোর্ট সৈয়দ।

পরদিন সকালে জানলাম জাহাজ রেড সি দিয়ে চলছে। সমুদ্রের জলের রংটাও বদলে গেছে, তবে লাল নয় কেমন যেন কালচে মতো। তাকিয়ে থাকলে গা শির শির করে। এখন আবহাওয়া আর আগের মতো নেই। জাহাজ রেড সি দিয়ে চলেছে একদিকে মিশর, অন্যদিকে সৌদি আরবের মরু অঞ্চল। স্বভাবতই তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে গেছে। এবার গন্তব্যস্থল পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে ঘোষণা করা হলো যারা পিরামিড, স্ফিঙ্কস ইত্যাদি দেখতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জাহাজ কর্তৃপক্ষ জাহাজ সুয়েজে পৌঁছলে তাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে মোটরকারে করে তাদের পিরামিড, স্ফিঙ্কস দেখাতে নিয়ে যাবে। এদিকে জাহাজ সুয়েজ ক্যানেলে ঢুকে সারাদিন ধরে চলতে থাকবে। সন্ধ্যেবেলা জাহাজ পোর্ট সৈয়দে পৌঁছবে। ইতিমধ্যে যারা পিরামিড দেখতে যাবে গাড়িতে করে পোর্টসৈয়দে এসে জাহাজে উঠবে। এসব কিছুর জন্য ৮ বা ১০ পাউন্ড বাড়তি খরচ বাবদ দিতে হবে। আমার পক্ষে অত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবে আমাদের অনেকেই টাকা জমা দিয়ে এল। নির্দিষ্ট দিনে ভোররাতে জাহাজ সুয়েজে পৌঁছলে পিরামিড যারা দেখতে যাবে তারা সবাই জাহাজ থেকে নেমে গেল।

আমি সকালে ডেকে গিয়ে দেখি আমাদের দুর্গাপুর ট্রেনিদের প্রায় সবাই চলে গেছে। জাহাজটা বেশ ফাঁকা লাগছিল। ব্রেকফাস্টের সময় ডাইনিং হলে গিয়ে দেখি অর্ধেক টেবিলই ফাঁকা। আমি ডেকে গিয়ে বসলাম। এখন জাহাজ চলেছে সুয়েজ ক্যানেলের মধ্য দিয়ে। খুবই সরু। পূর্ব দিক থেকে একটা জাহাজ এলে পশ্চিমদিকে আর কোনও জাহাজ যেতে পারবে না। কয়েকটা লেককে জুড়ে ক্যানেল তৈরি হয়েছে। ফলে জাহাজ ওই সমস্ত লেকে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না ক্যানেল ফ্রি হয়। অনেকটা আমাদের দেশের সিঙ্গল লাইন রেলওয়ের মতো। ক্যানেলের দুই পাশে মরু অঞ্চল। মাঝে মাঝে তৈল উত্তোলনের কূপ। তাপমাত্রা খুবই বেড়ে গেছে। জাহাজের গতিও খুব কম। সুয়েজ ক্যানেলের দৈর্ঘ্য ৭০-৭৫ কিলোমিটার মোটামুটি। ক্যানেলের একদিকে রেড সি, অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর। এক সময় দেখা গেল একটা জাহাজ জলে অর্ধেকটা ডুবে রয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধের সময় জাহাজটা ঘায়েল হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে জাহাজ পোর্ট সৈয়দে নোঙ্গর ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা নৌকো বিক্রির সামগ্রী নিয়ে জাহাজটা ঘিরে ধরল বিক্রির আশায়। বেশিরভাগই চামড়ার জিনিস— বেল্ট, মানি ব্যাগ, গ্লাভস, জ্যাকেট স্যুটকেশ আরও অনেক কিছু। ডেক থেকে ক্রেতাদের দরাদরি চলছিল। একটা বড়ো প্লাস্টিকের বালতিতে দড়ি বেঁধে ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। তারপর কুয়ো থেকে জল তোলার মতো করে বালতিতে করে প্রয়োজনীয় বস্তুটি ওপরে তুলে নিচ্ছিল। দর ঠিক হলে বা পছন্দ হলে বালতিতে করেই দামটা নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এটা অবশ্য এডেন বন্দরেও দেখেছিলাম। জাহাজ ঘিরে ৫-৬টা নৌকা। নৌকাতে ছিল নানারকম সৌখিন আর ইলেকট্রনিক্স জিনিস। ক্যামেরা, বাইনোকুলার, টেপরেকর্ডার, ট্রানজিস্টার আরও অনেক কিছু। ওই একই ভাবে কেনা-বেচা হচ্ছিল। সন্ধ্যে হতেই পিরামিড অভিযাত্রীরা সবাই ফিরে এলে জাহাজ আবার সরগরম হয়ে উঠল। তবে সবাই খুব শান্ত ছিল। তাই কথাবার্তা বিশেষ হলো না। তাই ডিনারের পর যে যার কেবিনে ঢুকে পড়ল। পরদিন জাহাজ ভূমধ্যসাগর দিয়ে চলছিল। সাগর অদ্ভুত রকম শান্ত। একটা বুদবুদও নেই। সারাদিন জাহাজ একই ভাবে চলল। তারিখটা ছিল ২৫ জানুয়ারি। আমরা জাহাজের ভারতীয় যাত্রীরা ঠিক করলাম পরদিন আমরা জাহাজে ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করব। পরদিন সকালে জাহাজের ডেকে গিয়ে দেখি সাগরে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে।

বড়ো বড়ো তিনতলা সমান ঢেউ ধেয়ে আসছে সামনের দিক থেকে। মনে হচ্ছিল জাহাজটাকে মোচার খোলার মতো ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু না। জাহাজটাই ঢেউয়ের মাথায় চেপে বসল। পর মুহূর্তে আর একটা ঢেউ। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস আর মেঘলা আকাশ। সাধারণত জাহাজ দোলে ডানদিক বাঁ দিক করে। কিন্তু তখন জাহাজ দুলছিল সামনে পেছনে করে। সব দেখে শুনে মাথায় উঠল সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের বিষয়টা।

জাহাজ থেকে মাঝে মাঝে যাত্রীদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছিল। দুবার দুটো উড়ো জাহাজ মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিয়ে গেল। আমার কিন্তু খুব একটা ভয় করছিল না। জাহাজডুবি হলে যে কী হতে পারে সে চিন্তা মাথায় ছিল না। দুপুরে লাঞ্চের সময় একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। স্যুপ দিয়ে গেছে প্লেটে করে। স্যুপটা মাঝে মাঝেই নিজে থেকেই টেবিলে পড়ে যাচ্ছিল প্লেট থেকে। একবার ডানদিকে পরের বার বাঁদিকে। যখন বুঝতে পারলাম তখন প্লেটটা যেদিকে হেলছিল সেদিকটা একটু উঁচু করে ধরছিলাম। জাহাজের ডাইনিং হলটা ছিল জাহাজের খোলের মধ্যে সি-লেভেলের সামান্য ওপরে। মাঝে মাঝেই পোর্ট হোলটা সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছিল আবার পরক্ষণেই ভেসে উঠছিল। আকাশ আর সি-লেভেলটা দেখা যাচ্ছিল। অনেকের আবার আগে যাদের সি-সিকনেস হয়নি তাদের আবার জাহাজের দুলুনিতে একটু আধটু সি-সিকনেস দেখা দিল। সারাদিন এভাবেই কাটল। পরদিন সমুদ্রের তাণ্ডব অনেকটা কম ছিল। এরপর পৌঁছলাম জিব্রাল্টার।

জিব্রাল্টারে তীরভূমি থেকে অনেকটা দূরে জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। বন্দরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তাই জাহাজেই থাকতে হয়েছিল। সমুদ্র শান্তই ছিল। জলে অসংখ্য মাছ খেলা করছিল। সেগুলো মাছ না ডলফিন না হাঙ্গর বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যদি হাঙ্গর হয় তাহলে সাঁতারু মিহির সেন বা বুলা চৌধুরীরা জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করেছিল কীভাবে? উত্তরটা জানা নেই। ঘণ্টা কয়েক পরে জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। এরপর জাহাজ চলতে শুরু করল আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে দিন রাত। এরপর এক সকালে ডেকে এসে দেখি জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জলের দিকে তাকিয়ে দেখি জলের রং নর্দমার জলের মতো কালো। জানলাম এটা লিভারপুল বন্দর। এখানেই আমাদের সমুদ্র যাত্রার ইতি। এবার ট্রেনে লন্ডন। □

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হবে গ্রন্থটি। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নীচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—
শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১
শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২২-২৪ জুলাই বারাণসীর রুদ্রাক্ষ কনভেনশন সেন্টারে ইন্টারন্যাশনাল টেম্পলস্ কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। উক্ত কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাগবতজী দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলিকে একটি ছাতার নীচে সঙ্ঘবদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সুপ্রাচীন কাল থেকে মঠ-মন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই কারণে এই মন্দিরগুলির উন্নতি সাধন ও পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান প্রয়োজন বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন।

মন্দিরগুলি হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড। কঠিন সময়ে মানুষের কাছে পৌঁছনো ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে মন্দিরগুলির স্বাস্থ্যবিধি, পরিষেবা বা পরিকাঠামো উন্নত করা উচিত এবং মন্দিরগুলির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষদের সংস্কার, মূল্যবোধ ও উপাসনা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া; দেশের তরুণ প্রজন্মকে সেবা, হিন্দু সমাজে মন্দিরের বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উক্ত কনভেনশনের উদ্দেশে পাঠানো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর চিঠিটি পাঠ করে ভাগবতজী মন্দিরগুলির পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের ইতিবাচক প্রভাবগুলি আলোচনা করেন। ভারত ও অন্যান্য দেশের সনাতন ঐতিহ্যের ৭০০রও বেশি মন্দিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাগবতজী আনন্দ প্রকাশ করেন ও এই কনভেনশনের মাধ্যমে সব মন্দিরগুলি একত্রিত হলে ছোট-বড়ো বিভিন্ন স্তরে হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হবে বলে তিনি জানান।

এই সম্মেলনের লক্ষ্য ধর্ম ও সমাজকে সংযুক্ত করে ভারতে মন্দির পর্যটন ও তীর্থস্থানের বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলা এবং হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের ভক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক ছাদের নীচে এনে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা। ভারতে ২০ লক্ষেরও বেশি মন্দির রয়েছে। এই সম্মেলনে ৪৫০টিরও বেশি বিখ্যাত মন্দির থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছেন। ভারতের মন্দির অর্থনীতি ৪ হাজার কোটি ডলার বা ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ২৭৩ কোটি টাকার। এই সম্মেলনের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উন্নত করার প্রশিক্ষণ গ্রহণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে একটি শ্বেতপত্র তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

এই এক্সপোতে মন্দির সম্পর্কিত তথ্যের ডকুমেন্টেশন, ডিজিটালাইজেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গ্রিন এনার্জি, ল্যান্ডমার্ক ম্যানেজমেন্ট, পরিকাঠামো বর্ধন, নিরাপত্তা ও নজরদারি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন, দুর্যোগ মোকাবিলা, মন্দিরের আলোকসজ্জা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা হয়।

বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, বিহারের তখত পাটনা সাহিব, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি দেবস্থানম, কেরলের পদ্মনাভস্বামী মন্দির, কর্ণাটকের বিরূপাক্ষ মন্দির, মধ্যপ্রদেশের মহাকালেশ্বর, তামিলনাড়ুর চিদম্বরম নটরাজ মন্দিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসকনের সন্ন্যাসী ও জৈনগুরুরাও এক্সপোয় উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত দেন।

শোকসংবাদ

তারকেশ্বর জেলার পুরশুড়া শাখার স্বয়ংসেবক সনৎকুমার বেরা গত ১৫ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। উল্লেখ্য, পুড়শুড়া গ্রামে ১৯৬৪ সালে বাবাসাহেব আপ্তেজীর প্রবাসকে কেন্দ্র করে যে শাখা শুরু হয়েছিল তার প্রথম মুখ্য শিক্ষক ছিলেন সহৎকুমার বেরা এবং তা তিনি দীর্ঘদিন পালন করেছিলেন। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র ও নাতি সবাই স্বয়ংসেবক।

* * *

দক্ষিণ কলকাতা বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ড. অজিত সরকার গত ৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ২ কন্যা, ২ জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক মদনদাস দেবী গত ২৪ জুলাই বেঙ্গালুরুতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক, সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ- সহ বহু দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

কলকাতা গোয়াবাগান শাখার স্বয়ংসেবক রোহিত কুমার দাস গত ৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ
উপন্যাস
জীবনী
পুরাণ কথা
বড়ো গল্প
ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৫৪।।

বিভিন্ন সভায় পাঠ-বক্তৃতা করেই ক্ষান্ত হননি মহানামব্রতজী। আশ্রমবাসীদের নিয়ে রাতে একান্তে শ্রীমদভাগবদ্ গীতার ক্লাস নিয়ে তার মর্মার্থ শেখাতেন। আবার পড়া ধরে শুনতেন ঠিকভাবে আশ্রমবাসীরা বুঝেছে কিনা।

শ্রীমহানাম অঙ্গণে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মহানামব্রতজী প্রতিদিনই রোগীদের খোঁজখবর নিতেন।

(ক্রমশ)